প্রাচীন কবি শ্রীল গোবিন্দ দাস বাবাজী

বিরচিত

শ্রীচৈতন্য চকড়া

সম্পাদক

পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা

গবেষক পণ্ডিত, জগন্নাথ মন্দির পুরী।

সদস্য ঃ প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ পরিষদ, ভারত সরকার, উপদেষ্টা সমিতি রাজ্য যাদুঘর (উড়িষ্যা), উড়িষ্যা প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষণ বিভাগ, রাজ্য সাহিত্য একাডেমী, হস্তলিখিত পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ বিভাগ, জগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

কৈলাস প্রকাশন

কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

বাংলা সাহিত্যের সেবায় উৎসর্গিতপ্রাণ

গবেষক, অধ্যাপক, সুসাহিত্যিক, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের বিস্ময়কর গ্রন্থকার

ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিলাম

শ্রীল গোবিন্দ দাস বাবাজী রচিত

শ্রীচৈতন্য চকড়ার

বঙ্গলিপি সংস্করণ,

যাঁর হাতে এ গ্রন্থ যোগ্য মর্য্যাদা পাবে, মূল্যায়ণ হবে যথাযথ, নিজ মূল্যে স্থায়ী স্থান পাবে, আমার বিশ্বাস। এ গ্রন্থ বাংলায় আসুক, বাংলা লিপিতে প্রকাশিত হোক, আমার এ ক্ষুদ্র আশা এবং দাবী পূর্ণ হল। এবার গবেষক অন্বেষক বিচারকের কাজ শুরু। আমার পূজা সার্থক।

—স্বামী শিবানন্দ গিরি

রাধাষ্টমী, ১৯৮৫

অবতরণিকা

জগন্নাথ দারুব্রহ্ম। শ্রীচৈতন্য ব্রহ্ম কল্পতরু। গঙ্গা জলব্রহ্ম। শ্রীচৈতন্য সজল করুণাব্রহ্ম। পুরুষোত্তম আচলব্রহ্ম। শ্রীচৈতন্য সচল ব্রহ্ম। স্মরণাতীত কাল থেকে যত মহাপুরুষ মহাত্মা সন্ত আচার্য্য শ্রীক্ষেত্রে শুভাগমন করেছেন তাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীচৈতন্য ভিন্ন আর কেউ-ই ক্ষেত্রবাসীর কাছে 'মহাপ্রভু' হয়ে ওঠেন নি। উৎকল ভাষায় মহাপ্রভু বলতে একমাত্র জগন্নাথকেই বোঝায়। দুই মহাপ্রভু আজ এক হয়ে গেছেন। জগন্নাথের কথা বলতে গেলে শ্রীচৈতন্যর কথা আসে। শ্রীচৈতন্যের কথা বলতে গেলে জগন্নাথের কথা আসে। নইলে দু'টো কথাই পূর্ণ হয় না।

জগন্নাথ দর্শন খণ্ডয়ে সংসার।
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দেশে দেশে যাইয়া।
সব লোক নিস্তারিলা জঙ্গম ব্রহ্ম হইয়া॥

এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কিছু বিদ্বান মনে করেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে উড়িষ্যার সামরিক পটুতা হ্রাস পেয়েছে। 'উড়িষ্যা ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায়' পুস্তকে লেখক শ্রীচক্রধর মহাপাত্র এ বিষয় বলিষ্ঠ যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। উর্দু লিপিতে লাহোর থেকে

প্রকাশিত শ্রী কে. পি. দুরাগুল রচিত 'নিমাইচাঁদ' গ্রন্থে, আসামের বিদ্বান শ্রীরাম রায় লিখিত মহাপুরুষ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গুরুলীলা গ্রন্থে শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং জগন্নাথের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কীর্তিত হয়েছে। পাশ্চাত্য ভাষায় প্রকাশিত অসংখ্য গ্রন্থাবলীর পাশাপাশি সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরা থেকে হিন্দী লিপিতে প্রকাশিত প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী সম্পাদিত 'নীলাচল লীলা' গ্রন্থে অভূতপূর্ব তথ্যাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে।

লক্ষ্য করছি, অসংখ্য গবেষক চৈতন্য সমসাময়িক উৎকল পণ্ডিত ভক্ত চিন্তানায়কদের সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্পর্ক ও ভাব বিনিময়ের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। মধ্যযুগীয় সমসাময়িক উড়িষ্যা সাহিত্যে, কাব্যে, সংগীতে, পদাবলীতে, শিল্পে, চিত্রকলা, স্থাপত্যে, চারুকলায় চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব যেমন খুঁজছেন তেমনই খুঁজছেন ঐ সব জীবন্ত ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-দলিলে চৈতন্য মহাপ্রভুর অকথিত অনুচ্চারিত অনুল্লিখিত জীবনের অজস্র মণিমাণিক্য। স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ বলেছিলেন উড়িষ্যার পঞ্চসখার কথা বাংলা সাহিত্যে আসা প্রয়োজন। যত তথ্যের সন্ধান মিলছে ততই আগ্রহ বাড়ছে। বক্ষমান এ গ্রন্থ প্রকাশ তারই একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

গবেষণার দৃষ্টি সব সময়েই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে ভিন্ন। এটা বুঝি। তবু যদি একটা মিলন ভূমি খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে উভয়তঃ লাভবান হবার সৌভাগ্য ঘটতে পারে। এই দৃষ্টি নিয়ে সামান্য গবেষণার ছাত্র রূপে ১৯৬২ অব্দে গঞ্জাম জেলায় শিকুলা গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাণ্ডার বাড়ী থেকে 'চৈতন্য গৌরাঙ্গ চকড়া' নামক প্রাচীন উৎকল করণী লিপিতে লেখা আর একখানি জীর্ণ পুঁথি প্রথমে পেয়েছিলাম। পুঁথিটির শেষভাগ ব্যতীত অন্যান্য তালপাতাগুলো বিশ্রীভাবে জুড়ে গিয়েছিল। কীটদষ্ট, অস্পষ্ট ঐ পুঁথির খণ্ডাংশটুকু নিয়ে আমি কাজ আরম্ভ করি। তার মধ্যে কিছু অংশ গবেষক পুরী, আনন্দময়ী আশ্রমের ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় ও কিছু অংশ বরেণ্য ভক্ত শ্রীজয়লাল ডালমিয়াকে গবেষণার জন্য দিয়েছিলাম। এই পুঁথির দু'টি পংক্তি থেকে জানা যাচ্ছে এই পুঁথির রচয়িতা ছিলেন সম্ভবতঃ বৈষ্ণব দাস।

এ পোথি রচিল দীন বৈষ্ণব দাস। (৩৭ পৃষ্ঠা)
দীন হীন বৈষ্ণবের চকড়া রচনা। (৪০ পৃষ্ঠা)

'চৈতন্য-গৌরাঙ্গ চকড়া' পুঁথির যে অনুলিপিটি পাওয়া গিয়েছিল তার অবস্থা ছিল শোচনীয়। পুঁথিতে উল্লিখিত তথ্য ও তত্ত্বও তেমন প্রামাণ্য নয়। এরপর প্রায় চার বছর আগে হঠাৎ ২৬শে জুন ১৯৮২ পুরীর গঙ্গামাতা মঠের মোহান্ত শ্রীবনমালি দাস গোস্বামী বালিসাহিতে কলিঙ্গ সংগীত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় এক জনসভায় এই পুঁথির ওপর কাজ করার জন্য আমায় প্রেরণা দিলেন। কিছুদিন পর জগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি ডঃ মেজর বি. কে. মহান্তি আর আমি মোহান্ত শ্রীবনমালি দাসের গঙ্গামঠে যাই। মঠে যত প্রাচীন পুঁথি ছিল সেগুলি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করার জন্য প্রার্থনা জানাই। জীবনের শেষ প্রান্তে এই পরিণত সাধক সমস্ত পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে যান। একখানি পুঁথি পূজার আসনে নিত্য সচন্দন সেবা পাচ্ছিল। পুঁথিটি আমার হাতে তুলে দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, 'আমার অন্তিম ইচ্ছা গ্রন্থটি প্রকাশ করুন'। এই পুঁথিই 'শ্রীচৈতন্য চকড়া'। আনন্দের কথা আজ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। বৈকুণ্ঠলোকে তিনি শান্তি পাচ্ছেন। সব থেকে খুশী হচ্ছেন।

পুঁথিটির রচয়িতা প্রাচীন কবি শ্রীল গোবিন্দ দাস বাবাজী (পট্টনায়ক)। চৈতন্য চকড়ার প্রথমে কবি নিজের পরিচয় দিয়েছেন। লিখেছেন—

করণ কুল সম্ভব নাম মো গোবিন্দ।
বৈষ্ণব দীক্ষারে দাস নাম মোর পদ॥

গ্রন্থ লেখা শেষ করার সময়ও আবার আত্ম পরিচয় দিয়েছেন—

বালিসাহি ঘনামল্ল পাটনার বাস।
পীতাম্বর পিতা মোর ভাই কৃত্তিবাস ॥
দেউলে করণ পাঞ্জী লেখন বেউসা।...

লেখকের জবানীতে জানা যাচ্ছে চৈতন্য চকড়া ১৫৩৪ অব্দে লিখে রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে সমর্পিত হয়েছিল। রাজার প্রেরণা ও আনুকূল্যে গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল এমন কথা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে—

'চতুর্দশ ষষ্ঠাধিক পচাশর শকে। চকড়া শেষ করলু কর্মানু বিপাকে ॥

অথবা

চৈত্র শুক্ল নবমীরে লেখন সম্পূর্ণ।

পুঁথির যে একমাত্র লিপিটি আমরা পেয়েছি সেটি ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রতিলিপি করা হয়েছিল। লিপিকার শ্রীশ্রীগঙ্গামাতা মঠের অধিকারী শ্রীশ্রীরসিকরাজ প্রভুর শিষ্য বাবাজী শ্রীল ভগবান দাস গোস্বামী মোহান্ত। গ্রন্থে লিপিকরণের সাল তারিখ উল্লেখ আছে—

'শকে ১৬৪৪ ভাদ্র পদ অষ্ঠম্যাস্ সম্পূর্ণ পুস্তক পাঠান্তর ১৭৪৪।

ময়ূরভঞ্জের সুপণ্ডিত ডঃ ফকিরমোহন দাস উক্ত লিপিকার শ্রীল ভগবান দাস গোস্বামীকে 'গৌরাঙ্গ ভাগবতের' রচয়িতা কবি বলে উল্লেখ করেছেন।

চৈতন্য চকড়া পুঁথিটি পয়ার ছন্দে লেখা। সময় সময়ে বাংলা ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষ করে যেখানে প্রসঙ্গক্রমে গৌড়ীয় ভক্তগণের শুভাগমন ঘটেছে। সংখ্যাগুলি ব্রাহ্মী। স্থানে স্থানে শকাব্দের উল্লেখ আছে। যতিপাত সর্বত্র ঠিক ঠিক নেই।

প্রাপ্ত পুঁথিটির পাতাগুলি অক্ষত। অখণ্ডিত। লেখা পরিস্কার, স্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ। লম্বা ১৪"। চওড়া ১½"। মোট ৫৭টি পাতা রয়েছে পুঁথিতে। পাঠোদ্ধার করে দেখলাম লেখক অত্যন্ত অভিজ্ঞ, তথ্যনিষ্ঠ, সংযত, জ্ঞানী স্বল্পভাষী, সুকবি, শব্দ চয়নে সিদ্ধহস্ত। নিজে ভাবুক। ভাবনিধি চৈতন্যের দিব্য ভাবোজ্জ্বল গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলি চিত্রকরের মত বাণীবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিকের মত সাল তারিখ তিথি নক্ষত্র স্থান কাল উল্লেখ করেছেন। ঘটনাগুলির পারম্পর্য্য রক্ষা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য প্রামান্য জীবনী গ্রন্থের সঙ্গে চৈতন্য চকড়ার মিল রয়েছে ভিতরে ভিতরে। কোথাও চকড়া অধিকতর বিস্তারিত সংবাদ দিচ্ছে। কোথাও প্রচলিত তথ্যের বিপরীত তথ্য জানাচ্ছে। কোথাও জানাচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন কথা। কবি নিজেই লিখেছেন গ্রন্থে ৫৪টি মাত্র ঘটনা লিপিবদ্ধ করলাম।

চউবন লীলা মোর সম্পূর্ণ হইলা॥
শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্মে ইহা সমর্পিলি।
চউবন লীলা মালা লেখি বঢ়াইলি॥

গ্রন্থে ৫৪টি লীলা উল্লিখিত হয়েছে। বহু অপ্রকাশিত প্রামাণিক বিষয় আছে। যথা—ভূমি দণ্ডবৎ প্রসঙ্গ, জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবতের দৃশ্যাবলি পরিদর্শন, (১৬১১ খৃষ্টাব্দের পর এসব কারুকার্য চুণের পলেস্তরায় ঢাকা পড়ে যায়। সুপ্রিম কোর্ট পর্য্যন্ত মামলা করে বর্তমানে ঐ পলেস্তরা মুক্ত করে ঐ ভাগবতের লীলা সম্প্রতি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদকই এই উদ্যোগ শুরু করেছিলেন), তেমনি নতুন

তথ্য পাই অতিবড়ি জগন্নাথের সঙ্গে মিলন, গোদাবরী রাজগুরুর পদত্যাগ, জগমোহনের স্তম্ভে ষড়ভূজ মূর্তি স্থাপন, অষ্টভূজ নারায়ণ দর্শন, উৎকলীয় বৈষ্ণবদের নাম প্রচার, কৃষ্ণচিন্তামণি রহস্য, সিদ্ধ বকুল প্রসঙ্গ, অচ্যুতানন্দ দাসের মন্ত্র গ্রহণ, আহুলা মঠ প্রসঙ্গ, মূর্তি মণ্ডপে শ্রীচৈতন্য মূর্তি স্থাপন, প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে প্রদীপ প্রজ্বলন, বৈষ্ণব গোস্বামী পরিবারের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন নিশ্চিত রূপে অভিনব। অন্য কতক বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সামান্য ভাবে সূচিত হয়েছে, এই গ্রন্থে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন লাবণ্যের কথা। আবার মহাপ্রভুর সমুদ্রে পতন, রাঘবের ঝালি সমর্পণ প্রভৃতি লীলা বর্তমান পুঁথিতে গুরুত্ব পায় নি।

গ্রন্থটি আমার কাছে থাকলেও সময়ের অপেক্ষায় যেন গ্রন্থটি ঘুমিয়ে ছিল। অল্পবিস্তর আলোচনাও করেছি। কিন্তু কারো কানে তেমন করে বাজেনি যেমন করে বেজে উঠলো আমার মিত্র জগন্নাথ প্রভুর অতিপ্রিয় শিবানন্দ গিরিজীর কাছে। বিহ্বল হয়ে পড়লেন গিরি মহারাজ। পাগলের মত হয়ে গেলেন। যেন রত্নের খনি খুঁজে পেয়েছেন। আমার মধ্যে প্রেরণা দিলেন। পাওয়াটা বড় কথা নয়। কি পেলাম বোঝাটাই আবিষ্কার। বার বার শুনতে এলেন। দলে দলে লোক নিয়ে এলেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিখিল বঙ্গ ভক্তিগীতি সম্মেলনে ১৯৮৫ সালের দোল পূর্ণিমায় গ্রন্থটি প্রাপ্তির সংবাদ ঘোষণা করলেন। নতুন কিছু পেয়েছি বললেই লোকে মানবে কেন? ধারাবাহিক প্রকাশ্য সভার আয়োজন শুরু করলেন বিদগ্ধ মানুষদের নিয়ে। দশ মাসে শতাধিক সভা করেছেন নিজে। অন্ততঃ কুড়িটি সভায় আমি যোগদান করেছি। আমার ভাঙা বাংলায় প্রবচন শুনে সংবেদনশীল শ্রোতৃকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। আমি প্রকাশ্যে বলেছি, আপনারা ভাগ্যবান, সাড়ে চার শ' বছর ধরে মহাপ্রভুর জীবনের অকথিত লীলার কথা আপনারাই প্রথম শুনছেন। চৈতন্যের জীবন কথাও চৈতন্যময়। জীবন্ত। যাঁর কথা তাঁরই ইচ্ছায় পাঁচ শ' বছর পর প্রকাশিত হচ্ছে এতে। আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আরও হাজার বছর পর আবার কোন নতুন অপ্রকাশিত পুঁথি আবিস্কৃত হতে পারে। তাঁর লীলা অনন্ত, এটা তারই প্রমাণ। বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণের উদারতা এবং আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। উৎসাহ দিয়েছে।

দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণীর মন্দির, আগ্মাপীঠ, আনন্দ আশ্রম, অনঙ্গমোহন হরিসভা, বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার গঙ্গাতীর ভাগবত সভা, আগরপাড়া ভোলাগিরি স্নেহনীড়—প্রভৃতি মঠে মন্দিরে হরিসভায় এমন কি টাকী হাউস, গ্রীন ভিউ, ভারতীয় ভাষা পরিষদ, মধুমিতা, পুরী ইউথ হস্টেল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ীতে ও সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেও সভার আয়োজন হয়েছিল। প্রতিটি আসরে তিলধারণের জায়গা ছিল না—এত ভীড় হয়েছিল। গিরি মহারাজ নিজেই নিলেন বঙ্গানুবাদ ও বঙ্গলিপিতে পাঠান্তরের দায়িত্ব। দিনের পর দিন কাজ করেছেন আমার কাছে বসে। এ বিষয় সব থেকে পরিশ্রম করেছেন নিষ্ঠাবতী প্রব্রাজিকা অর্পিতা মাই।

কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে 'কৈলাস' আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ১৮ই জুলাই '৮৫ শ্রীচৈতন্য চকড়ার পুঁথিটি সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের প্রদর্শন করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন গিরি মহারাজ। যুগান্তর, আনন্দ বাজার পত্রিকা, বর্তমান, আজকাল, সত্যযুগ, The Statesman, The Telegraph, Amrita Bazar Patrika, আকাশ বাণী, দূর দর্শন আন্তরিক আনন্দে দিকে দিকে সংবাদ ছড়িয়ে দিলেন আলোক চিত্র সহ। এর জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। একখানি ওড়িসী গ্রন্থ বাংলার এত প্রিয় হতে পারে কল্পনা করি নি।

কটকের রাস বিহারী মঠে উৎকলীয় ভক্তগণ সমবেত হলেন পুঁথির পাঠ শোনার জন্য। কটক চারণ গোষ্ঠীর সুযোগ্য সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রীগঙ্গাধর মহারাণা (কালিয়া) শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চ শত আবির্ভাব বর্ষে মূল পুঁথিটি উৎকল ভাষায় প্রকাশের পূর্ণ দায়িত্ত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ওড়িষ্যা সংকলনের জন্য একটি প্রচ্ছদ পট এঁকেছিলাম। আমার বাল্যবন্ধু প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় কলকাতার রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট থেকে ছ'দিনের মধ্যে ছেপে দিয়েছেন।

বাংলা সংস্করণটি প্রকাশে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেন 'কৈলাস' সংস্থার গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক শ্রীকৌশিক মিত্র। মুদ্রক শ্রীবিকাশ ঘোষ এগিয়ে না এলে গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হত না।

উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মিউজিয়ামের তালপাতার পুঁথি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত নীলমণি মিশ্র মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে পুঁথিটির প্রতিটি পৃষ্ঠা মাইক্রো ফিল্ম করে সুরক্ষিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। একজনের কথা বলতে গেলে একজনের কথা বাদ পড়ে যায়। তবু কলকাতায় সল্ট লেকের ৺শব্দপ্রসাদ রাউতের সুযোগ্যা পত্নী ডঃ শ্রীমতী বিমলা রাউতের আতিথ্য ও সৌজন্যে তাঁদের 'বৃন্দাবন' নিবাস দীর্ঘদিনের জন্য গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। প্রতিলিপির কাজে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন শ্রীসত্যব্রত পট্টনায়ক এবং আরও অনেকে।

সর্বশেষে আমার ইষ্ট প্রভু জগন্নাথের অপার কৃপাতে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব পঞ্চ শত বর্ষ উৎসবে মুদ্রিত আকারে লোক লোচনে এলো। প্রভু জগন্নাথের চরণে আমি প্রণাম জানাই।

রাধাষ্টমী, ১৯৮৫ — পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মা
পুরী, উড়িষ্যা

বিষয়সূচী

শ্রীচৈতন্য চকড়া মূল পুঁথির প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

চৈতন্য চকড়া পোথি লেখন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

জয় জয় জগন্নাথ নীলাদ্রি ঈশ্বর। জয় জয় জগন্নাথ ব্রহ্ম পরাৎপর॥ জয় জয় জগন্নাথ জগতের পতি। তব পাদপদ্মে মোর থাউ ভাবরতি॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য নাম অবতার। জয় জয় শ্রীচৈতন্য ভাবের সম্ভার॥ জয় জয় শ্রীচৈতন্য ভুবন মঙ্গল। তার পাদপদ্মে ধ্যান রহু সর্ব্বকাল॥
তার নাম রূপ গুণ অপূর্ব চরিত। লেখিবার আশ মো ভাগ্য উদিত॥ করণ[১] কুল সম্ভব নাম মো গোবিন্দ। বৈষ্ণব দীক্ষারে দাস নাম মোর পদ॥

শ্রীক্ষেত্র প্রদেশেরু চৈতন্য চরিত। লেখিবার ব্রত মোর হইল উদিত॥ চৈতন্য চকড়া[২] শুভ নামে এ রচনা। ভক্ত গণংক মাঝে হইব যে ঘেনা॥
নীলাচলে[৩] শচীসুত যে লীলা রচিল। অপ্রকট প্রকটরে জনে উদ্ধারিল॥

টীকা ঃ—(১) জগন্নাথ মন্দিরে ১৪টি করন ও রাজদরবারে ১০টি করণ ছিলেন। এখনও আছেন। তাঁরা সমস্ত শাসন কর্মের দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্ত্তা অধিকারী ছিলেন। সমস্ত দলিল দস্তাবেজের কাজ এই করণরাই করে থাকেন। বাংলা 'করণিক' বা 'কেরাণি' শব্দের অনুরূপ।

(২) চকড়া—প্রামাণিক আঞ্চলিক বিবরণী বিশেষ, regional history, যেমন 'রামেশ্বর চকড়া', 'মঠ চকড়া', 'রেবণা চকড়া'। বাংলা কড়চা শব্দের অনুরূপ। যেমন, গোবিন্দদাসের কড়চা, মুরারি গুপ্তের কড়চা।

(৩) পুরীর প্রাচীন পৌরাণিক নাম। স্কন্দ পুরাণ, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বহু গ্রন্থে উল্লিখিত।

পঙ্গা চরিত সকল আহরণ কলু। স্বভাবে বুলিয়া তার পাদ আশা কইল॥ যেবা যেঁউ ঠাবে প্রভু লীলা আচরিল॥ লিহিব সে কথামান জ্ঞান অনুকূলে॥

প্রকট হইল ক্ষেত্রে চৈতন্য ঠাকুরে। পঞ্চ ক্রোশী পথে প্রভু উদয় হইল॥ ভাদ্রনবমী শুক্ল সংকীর্ত্তন কইল। বুঢ়ালিঙ্গ[৪] পাটনারে প্রবেশ করিল॥ কপোতেশ্বর দর্শন করিল সে কালে। ভাবাবেশে গৌরচন্দ্র রহে ভাব ভোলে॥ জগন্নাথ কৃষ্ণচন্দ্র অপ্রাকৃত রূপ। স্মরণ করিণ প্রভু আরম্ভিল স্তোক॥ মহাভাব দেখিতার বেপথু শরীর। নাহি ভেদভাব কণ্টকিত দেহ তার॥ ভাব দেখি নিত্যানন্দ প্রভু দণ্ড নেই। তিনি খণ্ড করি ভাঙ্গি দেলেকে ভাসাই॥ অহংকার সোহংভাব ভার্গবী স্তোতরে। ভাসিয়া চলিলা দণ্ড তরঙ্গ বিধিরে[৫]॥

টীকাঃ—(৪) বর্ত্তমান চন্দনপুরের প্রাচীন নাম। এখানে 'বুঢ়ালিঙ্গ' নামে মহাদেব রয়েছেন। 'স্কন্দপুরাণ' বর্ণিত 'কপোতেশ্বর' সেই অঞ্চলের শিবকে বোঝায়।

(৫) ভার্গবী—'কুয়াখাই' নদীর উপনদী, চন্দনপুরের নিকট প্রবাহিত। স্থানীয় অধিবাসীরা আজও এই নদীকে 'দণ্ডভাঙ্গা' নদী বলে। এই নদীর অববাহিকায় ভৃগুঋষির প্রাচীন আশ্রম তথা যজ্ঞকুণ্ড ও দেবস্থলী রয়েছে। পুরীর কাছেই এই নদী। মঙ্গলাঘাটে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর পরদিবস নন্দোৎসবের দিন যমুনাস্নানে সমগ্র উড়িষ্যাবাসী এই নদীতে স্নান করে। নন্দোৎসবের দিন মহাপ্রভু যমুনাস্নানে ঐ ঘাটে স্নান করেছিলেন। 'দণ্ডগ্রহণমাত্রেন নরনারায়ণো ভবেৎ'। দণ্ডের অপর নাম 'ব্রহ্মদণ্ড'। সেই দণ্ডধারণ করে সন্ন্যাসীরা জগৎগুরু নামে বিদিত হন। যখন সন্ন্যাসীরা ভগবৎচিন্তনে তন্‌লীন হয়ে যান তখন দণ্ডত্যাগ ক'রে অত্যাশ্রমী নামে অভিহিত হন। চৈতন্যদেবের সেই তটস্থ অবস্থা দেখে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ, তাঁর দণ্ড গ্রহণের আবশ্যকতা নেই বুঝে দণ্ড বিসর্জন করলেন। 'সোহহং' যখন 'দাসোহং' অবস্থায় এসে যায় তখন অহংকার লীন হয়ে যায়।

দণ্ডভঙ্গা নদী নাম বৈষ্ণবে চিন্তিলে। ভৃগুর আশ্রম তটে সে দণ্ড লাগিল (এ)॥ বুঢ়ালিঙ্গ পাটনারে নাম সংকীৰ্ত্তন। আনন্দরে নিশি পুহাইল মহাজন॥ প্রাত(ঃ)কালে ভার্গবীরে করিণ স্নাহান। ক্ষেত্রপথে চলে প্রভু প্রমুদিত মন॥ বাটরে দিশিলা বড় দেউলর শোভা। দর্শনে বৈষ্ণবগণ হেলে অতিলোভা॥ গৌরচন্দ্র ধ্বজা[৬] দেখি নৃত্য আরম্ভিল। গজ গজ গজ গজ হুঙ্কার করিল॥ জগন্নাথ নাম মুখে ভাবে ন আসই। গজ্র গজ শব্দরে চৌদিশ কম্পাই।। পথে কেহ বা উৎকলি জনর দর্শনে। কহন্তি বৈষ্ণবগণ তুম্ভে ভাগ্যবানে॥ বাটরে মঙ্গলা[৭] প্রভু ভাবে নিরেখিল। অশ্বত্থ তরুর মূলে প্রভু বিশ্রামিল॥ তরুতলে বাট-দেবী সর্ব্বজন জানে। বিশ্রামিল তথি গোরা পুলকিত মনে॥

টীকাঃ—(৬) চৈতন্য মহাপ্রভু মন্দিরের ধ্বজা দর্শনকালে বালগোপালের মূর্তি দর্শন করেছিলেন একথা 'চৈতন্য ভাগবতে' উল্লিখিত আছে।

'প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্তারবিন্দো,
বামালোক্য, স্মিতসুবদনো বালগোপাল মূর্ত্তিঃ'॥

(৭) বর্ত্তমান যে বাটমঙ্গলা (পথমঙ্গলা) বিগ্রহ আছে প্রাচীনকালে সেই মূর্ত্তি এক অশ্বত্থ তরুমূলেই ছিল। সেই স্থানের নাম ছিল 'হুড়হুড়িয়া-কুড়' (উলুধ্বনির কূল)

'মঙ্গলা পথপ্রান্তে চ পিপ্পল তরুবাসিনী
দর্শনাৎ অঘসর্বানি বিনশ্যন্তি পদে পদে' (নীলমণি পুরাণ ৪/৪১)

গোপী আচার্য্য ঘেনিণ খদি পরসাদ[৮]। প্রভু হাদে ভেটিবারে ভাবে গদগদ ॥ ঘাটুআ[৯] বাটুআ[১০] পৃষ্টি[১১] কটুআল[১২] সাথে। ভাবরূপ দেখিন সে প্রণমিল পথে ॥ সকলে পথরে প্রভু সঙ্গে যাত্রা কৈল। ফলমূল পয়রস আনি সমর্পিল ॥ শকবর্ষ চউদশ একত্রিশ শুভ[১৩]। ভাদ্র শুক্লনবমী দিবসান্ত ঠাব ॥ ন্যাসী গোরা রায় আসি ক্ষেত্রে প্রবেশিলে। কৃষ্ণনাম প্রেমভাবে ভসাইয়া দেলে ॥ অঠারো নলার সেতু[১৪] সবায় দেখিল। আলম্বা দেবী প্রণমি রাত্র বিশ্রামিল ॥ ক্ষেত্র প্রবেশরু লীলা লিহিব বিধিরে। শুন ভক্তগণ কিবা ঘটিল পৃথ্বীরে ॥ অঠারো নলা নিকটে প্রভু বিরাজিলা। আলম্বা দেবীর[১৫] কথা শুনি প্রণমিলা ॥ ভাদ্র শুক্ল একাদশী উদয় ভাস্কর। আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন ভুবনমঙ্গল ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শব্দার্থ :—ঘেনিন—ঘেরিয়া সকলকে একত্র ক'রে, হাদে—হৃদয়ে, পয়রস—পায়স

টীকা :—(৮) শ্রীজগন্নাথদেবের পরিহিত বস্ত্রের প্রসাদী মালা (৯) যারা ঘাটের পারাপারের ঘাট-ছাড়পত্র দেয়।

(১০) পথের সাথী। (১১) জগন্নাথের যাত্রাপথে শুল্ক আদায়কারী।

(১২) পথরক্ষী সিপাহী। (১৩) শকাব্দ ১৪৩১ (খ্রী ১৫০৯)।

(১৪) এই সেতু করবংশীয় উড়িষ্যার রাজা মচ্ছকেশরীর দ্বারা নির্মিত হয় নবম শতাব্দী নাগাদ। উত্তর দিক থেকে পুরীধামে প্রবেশ করতে গেলে ভার্গবী নদীর উপর নির্মিত এই সেতু ভিন্ন কোন হাঁটা পথ ছিল না। যদিও এই সাঁকোর নাম আঠারোনলা, এতে উনিশটা সুড়ঙ্গ আছে।

(১৫) স্কন্দ পুরাণোক্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মাহাত্ম্যে অষ্টশক্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই দেবীর নাম 'লম্বাদেবী' বলে উল্লেখ আছে। জগন্নাথের নবকলেবরের সময়ে মহাদারু

প্রভু নিজে বহির্বাস কটি-তটে ভিড়ি। আরম্ভিল ভূমি দণ্ডবত[১৬] দুরলভা যে ভারি ॥ জগতে এমন্ত ক্রিয়া নেত্র ন দেখিলা। প্রণত শ্রীবিশ্বম্ভর লীলা আচরিলা ॥ হরে কৃষ্ণ মহানাম মুখরে রটিয়া। বেড়া পরিক্রমা করি 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া ॥ চারিদণ্ড রহি তথি বিহলিত মন। মুরছিত প্রায় তনু, নেত্র থন থন ॥ সার্বভৌম অধিকারী মুক্তিশিলা[১৭] পতি। গৌরচন্দ্রে নিমন্ত্রণ করিয়া মিনতি ॥ রাত্রকালে গঙ্গামাতা মঠে চেতা-লভি। ভক্তগণ নিহারিলে সর্ব্বে অনুভবি ॥ নিত্যানন্দ প্রভুগুণ দামোদর জ্ঞানী। মুকুন্দ, জগদানন্দ, কনহাই (ঘুন্টিয়া) সুমানী ॥ উৎকলি করণ, শিখি পাঞ্জিয়া আবর। জীবদেব রাজগুরু পরিচ্ছা নিকর ॥ জ্ঞান বৃদ্ধ গোদাবর[১৮] কাশী মিশ্র আদি। দর্শন করিলে গোরা নাম প্রেম-বাদী ॥

শব্দার্থ ঃ—ভিড়ি—বেঁধে, দুরলভা—দুর্লভ, এমন্ত—এমন, বিহলিত—বিগলিত, থন থন—ছল ছল, চেতালভি—চেতনালাভ করে, কনহাই—কানাইখুন্টিয়া, শিখি—শিখি মাহান্তি, পাঞ্জিয়া—যারা পাঁজী বা দিনলিপি লেখে, পরিচ্ছা—মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ পরিচালক, নিকর—সমূহ, আবর—মিলিত ভাবে

আহরণ করে আনার পথে এই দেবীর কাছে একটি রাত্রি যাপন করার নিয়ম আছে। পরদিন সকালে শোভাযাত্রা সহকারে সেই মহাদারু শ্রীমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের যাত্রাও স্বাভাবিক ক্রমে ঠিক এই দেবীর কাছে এসে থেমে গেল একটি রাত্রির বিশ্রামের জন্য।

(১৬) সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে যেখানে প্রলম্বিত হাত দুটি গিয়ে পৌঁছয় সেখান থেকে পুনরায় দণ্ডবত করতে করতে মহাপ্রভু মন্দিরে পৌঁছিয়ে, মন্দির পরিক্রমা ক'রে এসে দাঁড়ালেন। এই মহাভাবপূর্ণ দণ্ডবত পূর্বে কখনও ছিল এমন কথা আমরা জানি না। কিন্তু, মহাপ্রভু এইভাবে প্রণাম করায়, আজও এই প্রথা প্রচলিত আছে। শ্রীচৈতন্য অনুসরণে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পিতা ও বঙ্গভূমি থেকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতে করতে শ্রীক্ষেত্র প্রবেশ করেছিলেন।

(১৭) বাসুদেব সার্বভৌম আশ্রমের প্রাচীন নাম 'গঙ্গামাতামঠ'। গঙ্গামাতা মঠের কাছে শ্বেতগঙ্গাতীর্থ বিদ্যমান। শ্বেতগঙ্গার তটদেশে একটি বিষ্ণু পাদ-পদ্ম আছে। সেই পদচিহ্নের নাম 'মুক্তিশিলা'। 'গঙ্গামাতা মঠে'র অধীশ্বর এইসব আধ্যাত্মিক স্থানের অধিকারী।

(১৮) গোদাবর মিশ্র গজপতি পুরুষোত্তম দেবও, প্রতাপরুদ্রের রাজগুরু ছিলেন। গোদাবর মিশ্রের খুল্লতাত পুত্র কাশী মিশ্র।

ঘরে ঘরে পুরে পুরে চহল পড়িলা। ধন্য ন্যাসী প্রণমিয়া পরিক্রমা কইলা॥ নরনারী ক্ষেত্রবাসী বড় পণ কলে। গোরা দরশন অর্থে আকুষ্ঠিত হেলে॥ কুঞ্জমঠে[১৯] গোরা রায় কলেক বিশ্রাম। নিত্য শাস্ত্রচর্চা হেলা ভট্টাচার্য্য ঠাম॥ ভাব দেখাইয়া জ্ঞান অহং বিনাশিল। অপূর্ব্ব মুরতি ষড়ভুজ[২০] দেখাইল॥ নিত্য বেড়া-পরিক্রমা রচিল গোসাই। ক্ষেত্র নরনারী মন তাহা ঠারে রহি॥ সন্ধ্যা আরতি দরশন যে জগমোহনে[২১]। সমর্পণ মহাভাব কৃষ্ণর চরণে॥ কার্ত্তিক মাসরে প্রভু ভাবে নিরেখিল। ভাগবত লীলা[২২] এথি আশ্চর্য্য হইল॥ শিখি ঘেনি গোরা রায় বেড়া বুলাইলে। দেবা দেবী সহ প্রভু দেউল দেখিলে॥

শব্দার্থঃ—চহল=আলোড়ন, বড় পণ=প্রশস্তি, অর্থে=জন্যে, কলেক—করিল, হেলা—হইল, বেড়া পরিক্রমা—মন্দির পরিক্রমা, ঠারে—নিকটে, ঘেনি—সঙ্গে নিয়ে, বেড়া বুলাইলে—পরিক্রমা করাইল।

টীকাঃ—(১৯) পুরীর বালীসাহির মধ্যে ঘনামল্ল সাহিতে দণ্ডেশ্বর গ্রামনিবাসী শ্যামানন্দ গোস্বামীর স্থাপিত মঠের নাম। এইস্থানে প্রাচীন গোপীনাথ বিগ্রহ বিদ্যমান আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে এসে প্রথমে এইস্থানে বাস করেন।

(২০) উৎকল দেশে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ষড়ভুজ মূর্ত্তি বিশেষভাবে পূজিত হয়। বঙ্গদেশে যেমন সর্বত্র নদীয়া বিনোদ নবদ্বীপচন্দ্রের দ্বিভুজ বিনোদবেশের পূজা, উড়িষ্যায় সর্বত্র তেমনই মহাপ্রভুর ষড়ভুজবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত এবং পূজিত হয়। এই ষড়ভুজ মূর্ত্তি রয়েছে (১) গঙ্গামাতা মঠে (২) জগন্নাথের মন্দিরে জগমোহনের উত্তর-পূর্ব কোণের স্তম্ভোপরি উৎকীর্ণ এবং (৩) ভিতরক্ষ শৃঙ্গারী পাণ্ডার গৃহমন্দিরে (ধাতুর মূর্ত্তি, ১৯ আঙ্গুল)

(২১) শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দির মুখ্যত চারিভাগে বিভক্ত। পশ্চিম থেকে প্রথমে মুখ্যমন্দির বা বিমান, দ্বিতীয় মন্দির মুখশালা অথবা নাটমন্দির, তৃতীয় মন্দির জগমোহন যেখানে নৃত্য, গীত, ভজন হয়, চতুর্থ মন্দির ভোগমণ্ডপ, রাজভোগ নিবেদনের স্থান।

(২২) পুরীতে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী থেকে ভাদ্র শুক্লদশমী পর্য্যন্ত জগন্নাথ মন্দিরে অভিনয় মাধ্যমে কৃষ্ণলীলা বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়। কৃষ্ণ জন্মে থেক কংসনিধন

ভাগবত কৃষ্ণলীলা দেউলে দেখিণ। ভাবময় গোরা রায় চমৎকার পুন॥ সর্ব্বত্র দেউলে ভাগবতের বর্ণন[২৩]। বড় শৃঙ্গাররে রাধা প্রেমর গায়ন[২৪]॥ গীতগোবিন্দ, মুদিত গোবিন্দর প্রীতি[২৫]। তটস্থ ভাবনা হেলা বিশ্বম্ভর মতি॥ নারীরূপে সেবকক্ষ ঘটনী দেখিয়া। স্বর্ণ কর্ণ ভূষা মালা তুলসী লইয়া॥ কুচ কুঙ্কুম লেপন বক্ষ আবরণ। অঙ্গনা ভাবর হাব সে ভাব লক্ষণ॥ বোইলে হে নিত্যানন্দ ভাগবত লীলা। নিত্য নীলাচলে দেখ ভাবে করে খেলা॥ রাস পঞ্চাধ্যায়ীর গানপঞ্চ করে[২৬] দেখি। প্রভু ভাগবতে লীন, নিত্য হইল সুখি॥ কার্ত্তিক দশমী রবিবার দিবসরে। অঘটন ঘটন ঘটিলা দেউলরে॥ মুখ মন্দিররে গোরা মহাভাবে রহি। প্রভু দরশন ইচ্ছা প্রবল হুই॥

শব্দার্থঃ—সেবকক্ষ—সেবকগণের, ঘটনী—সেবাক্ষেত্রে, হাব—হাবভাব, বোইলে- বলিলেন, মুখ মন্দির রে—জগমোহনের পরের অংশ (২২ নং টীকা দ্রষ্টব্য)

পর্য্যন্ত বিভিন্ন লীলাগুলি গীত ও অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য হল,—কোন মঞ্চ থাকে না। সাধারণ দর্শকও এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে, মন্দির থেকে বিগ্রহ স্বয়ং (প্রতিনিধি মদনমোহন) আসেন কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করতে। কংস, শিব, পুতনা, কালীয় নাগ প্রভৃতি ভূমিকায় কোন সেবক অল্প পারম্পরিক সাজসজ্জায় অবতীর্ণ হন লীলা প্রকট করার উদ্দেশ্যে। যে সময়ে যে ভাগবতে লীলা আছে সেই সময়ে সেই লীলা আস্বাদান করাই এই লীলাভিনয়ের উদ্দেশ্যে।

(২৩) ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে, চৈতন্য মহাপ্রভুর চারশত বছর পূর্বে নির্মিত জগন্নাথ মন্দিরের বিমান অংশে নিম্নদেশে প্রাচীরগাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম থেকে কংসনিধন পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি লীলা ধারাবাহিক ভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে এইসব কারুকার্য্য, এবং মূর্ত্তিগুলি চূণের পলেস্তারায় চাপা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮০ সালে এই গ্রন্থের আবিষ্কারক, সরকার বাহাদুর ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দপ্তর থেকে এই দাবীর সত্যতা প্রমাণ করতে বলায়, মন্দিরের একটি অংশের পলেস্তারা উন্মোচন করে এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। মন্দিরের এই অংশের পূর্ণ কারুকলা আজ উদ্ঘাটিত হয়েছে।

(২৪) শ্রীজগন্নাথদেবের শায়নকালীন শৃঙ্গারকে বড় শৃঙ্গার বলে। বড় শৃঙ্গারের অর্থ হ'ল মুখ্য শৃঙ্গার। সেই শৃঙ্গারের সময়ে রাধা নামাঙ্কিত গীতগোবিন্দ মুদ্রিত

ভাবের আবেশে গোরা হইল তৎপর। প্রতিহারী অনন্ত (গোচ্ছিকার)[২৭] যে বলিষ্ঠ শরীর ॥ নিষেধ করন্তে গোরা ভাব-তনু ধরি। করে আড়াইন দেলে দ্বার-প্রতিহারী ॥ অনসর পিণ্ডি[২৮] ঠারে যাইন পড়িলে। হাহাকার দেউলরে সর্ব্বে নিবর্ত্তিলে ॥ মত্ত গজ প্রায় বিশ্বম্ভর সিংহাসনে। চরণ প্রসাদ লেই ফেরিলে সুগনে ॥ ক্ষণমাত্রে ক্ষেত্ররে কথা প্রকটিলা। অনন্ত যে প্রত্যক্ষরে ঈশ্বর কহিলা ॥ প্রভুর সমীপে মিলি তুলসীর মালা। তিলক ধরিয়া শিষ্য বোলি প্রকল্পিলা ॥ রাজার ছামরে যাই করণে কহিলে। এমন্ত ভকতকথা সরবে জানিলে ॥ রাজা আজ্ঞা দেলে সর্ব্বে আলপন কর। সকল ঘটনা কহ মোহর ছামুর ॥ বৈশাখ মাসর শুক্ল পঞ্চমীর দিনে। গোরা ভাবে বশ হইল সম্প্রদা প্রধানে[২৯] ॥ লাবণ্য সে দেবদাসী নিত্য সেবা করে। দিবাবসানে দর্শনে গায়ে গীত সুরে ॥

শব্দার্থ ঃ—আড়াইন—সরিয়ে দিল, যাইন—যাইয়া, নিবর্ত্তিল—নিস্তব্ধ হয়ে গেল, ছামুরে—সম্মুখে, করণে—করণিক, সরবে—সকলে, আলপন কর—নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন কর, ছামুরে—গোচরে, বশ—বশবর্ত্তী।

বস্ত্র শ্রীজগন্নাথকে পরানো হয়। আর সেই সময়ে দেবদাসী রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সুস্বরে গান করেন। তখন ঐ দেবদাসীর উর্দ্ধাঙ্গ থাকে উন্মোচিত। বক্ষদেশ কুমকুম চন্দনে অলঙ্কৃত থাকে।

(২৫) প্রথম নৈবেদ্যের সময়ে জগমোহন দেবদাসী 'গীতগোবিন্দ' আর 'মুদিতগোবিন্দ' কাব্য তথা প্রাচীন উৎকলীয় রাসবর্ণনা গান করেন, নৃত্য করেন।

(২৬) কার্ত্তিক শুক্ল একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচ দিনকে 'পঞ্চক' বলে। সেই সময়ে 'জগমোহনে' মদনমোহন বিগ্রহের কাছে শ্রীমদ্ভাগবতের 'রাসপঞ্চাধ্যায়ী' পাঠ হয়।

(২৭) জগন্নাথ মন্দিরের প্রাচীন দ্বার রক্ষীকে প্রতিহারী বলে। তার গোষ্ঠী প্রতিহারী 'নিয়োগ' নামে খ্যাত। সেই নিয়োগের একজন মুখ্যনায়ক থাকেন তার পদবী গচ্ছিকার। অনন্ত প্রতিহারী সেই গচ্ছিকার বংশের ব্যক্তি। কিংবদন্তী আছে তিনি একবার একটি মত্ত হস্তীর দন্ত ধরে তাকে আয়ত্ত করেছিলেন বলে তার বংশধরেরা মত্তগজ প্রতিহারী নাম ধারণ করেন। অনন্ত প্রতিহারীর বল বিক্রম এই কিম্বদন্তীতে প্রকাশ পেয়েছে।

গরুড় স্তম্ভ[৩০] পছরে মহারস ভরে। বৈষ্ণবী ভক্তি প্রধানা সর্ব্বে মান্য করে॥ অক্ষয় তৃতীয়া বহু জন সমাবেশ। স্তম্ভের সমীপে ভীড় ন যায় নিশ্বাস॥ ভাবের আবেশে গৌর ভুঁইতে লুটিয়া। আরতি উঠিলা সর্ব্বে উঠিলে জাগিয়া॥ হরি হরি জয়গান কম্পিলা ভবন। ব্যগ্রভরে মিলিলেন লাবণ্য[৩১] তক্ষণ॥ জন ঘোষে ইষ্টমুখ দর্শন ন পাই। উৎকণ্ঠিতা দাসী চড়ে প্রভু পৃষ্ঠে যাই॥ নাহি জ্ঞান মন তার জগন্নাথে রত। আরম্ভিল সুরে গীত চন্দনে-চর্চিত॥ আরতির অবসানে লাবণ্য হেরিল। প্রভু পাদে পড়ি সেই আকুলে কান্দিল॥ ন্যাসী পায়ে পড়ি দাসী আকুল বচনে। মহাপরাধী ক্ষমন্ত আকুলিত মনে॥ ত্রাণ কর ক্ষম দোষ পতিতে উদ্ধর। অজ্ঞান দাসীর অপরাধ ত্রাহি কর॥ প্রভু বলে ভাবাবেশে ধন্য কে রমণী। বাহ্যজ্ঞান হরা দাসীকুল শিরোমণি॥ সন্ন্যাসীর নারী অঙ্গ পরশে অপরাধ। অহং কিছু ছিল আজ মিটাইল সাধ॥ সেহি দিনু সেহি দাসী দূরে থাই দেখে। প্রভুর প্রত্যাগমনে যায়ে মহা সুখে॥

শব্দার্থঃ—পছরে—পিছনে, ন যায়—নেওয়া যায় না, ন পাই—না পেয়ে, আকুলিত—কাতর, সেই দিনু—সেই দিন থেকে।

টীকাঃ—(২৮) মুখ্যমন্দির আর মুখ্যশালার ভিতরে যে প্রশস্ত স্থান আছে, সেইস্থানে স্নান পূর্ণিমা থেকে আষাঢ় অমাবস্যা পর্য্যন্ত শবর সেবকগণ যে পূজা করেন, 'অনসর' বলা যায়। যে স্থানে সেই পূজা হয় তার নাম 'অনসর পিণ্ডি' বা গুপ্ত পূজার স্থান।

(২৯) দেবদাসী নিয়োগের প্রাচীন প্রচলিত নাম সম্প্রদায় নিয়োগ। এটি একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় 'আধ্যাত্মিক গোষ্ঠী'। সুন্দরী বিদুষী ভক্তিপরায়ণা মহিলারা দেবদাসী রূপে সেবা করেন। কবি জয়দেবের পত্নী পদ্মাবতী দেবদাসীর নৃত্যসেবা করেছিলেন। নিয়োগ তিন ভাগে বিভক্ত ঃ গায়িকা, নর্ত্তকী, আর বাহির গায়নী (যারা বাহিরে গায়)। যারা 'বড়শৃঙ্গারের' সময় গান করেন তাদের 'ভিতরগায়নী' বলা হয়।

(৩০) শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একবার মাত্র মন্দিরের ভেতরে সিংহাসনের কাছে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করেছিলেন। তারপর থেকে 'গরুড়স্তম্ভের' বাম দিকে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ হস্তে স্তম্ভ স্পর্শ ক'রে রাধা ভাবে জগন্নাথের দর্শন করতেন। এইখানে দাঁড়িয়ে দর্শন করলে জগন্নাথকে দেখা যায় কিন্তু বলরামকে দেখা যায় না।

রাধাভাবের সঙ্গে এটি অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থের চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে গোস্বামীপাদ লিখেছেন,

যাবৎকাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে। প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে॥

(৩১) এই প্রসঙ্গে 'চৈতন্যচরিতামৃততে' (১৪ অধ্যায়ে) 'লাবণ্যে'র নাম না উল্লেখ থাকিলেও উল্লেখ আছে—

উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা। গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া॥

গরুড় স্তম্ভের উপর ওঠা সম্ভব নয় তেমনি প্রভুর স্কন্ধে দাঁড়িয়ে আছে এটিও অসম্পূর্ণ বিবরণ। "উড়িয়া এক স্ত্রী" বলে উল্লেখেও অনেক সংবাদের অনুল্লেখ থেকে যায়। ঘটনাটি সাধারণ নয় পরবর্তী ছত্রেই প্রকটিত,—

দেখি গোবিন্দ আস্তে ব্যস্তে স্ত্রীকে বর্জ্জিলা। তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা॥

আদিবশ্যা (১) এই স্ত্রীলোকের না কর বর্জ্জন। করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ও শ্রীসুবোধ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থে 'আদিকন্যা', শব্দের অর্থ বলেছেন—'বিচার অনভিজ্ঞ মহামূর্খ। এই শব্দের মূল অর্থ হওয়া উচিৎ 'আদি' অর্থে প্রক্রমে যিনি জগন্নাথের বশ্যতা গ্রহণ করেছেন। দেবদাসীর সঙ্গে প্রথমে জগন্নাথের বিবাহ হয়। এই শব্দে বোঝা যাচ্ছে যে 'রমণী' দেবদাসী ছিলেন। মুক্তা মাহারি লিখিত 'দেবদাসীর নৃত্য পদ্ধতি' গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

মাহারি যে দেবদাসী বশ্যা নিবেদিতা। সধবা ভাবরে সেবা করই বনিতা॥

অনেকে এই শব্দটি ভুল ক'রে 'পতিতা' অর্থ ধরেছেন। এই রমণী সম্বন্ধে 'চৈতন্যচরিতামৃততে' উল্লেখ রয়েছে মহাপ্রভুর মুখের প্রশস্তি—

আস্তে ব্যস্তে সেই স্ত্রী ভূমিতে নামিলা। মহাপ্রভুকে দেখি চরণ বন্দন করিলা॥ তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা। এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা॥ জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মনপ্রাণে। মোর কান্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥ অহো ভাগ্যবতী এই বন্দ ইহার পায়। ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয়॥

প্রভুর দরশন স্থল পাদরজ তোলি (তোড়ি)। শিরে বোলি বোলে জয় জয় গৌর হরি ॥ দীক্ষা নহি কণ্ঠে নেলা তুলসীর মালা। তিলক হরি মন্দির কপালে শোভিলা ॥ সম্প্রদা নিয়োগ এহি[৩২] নিয়ম রখিলা। দেবদাসীগণে প্রভু অনুগত হইলা ॥ রামানন্দ রায় শুনি ইহার চরিত মধুর। লাবণ্যে নিয়োগ পতি করিলে সত্বর ॥ এহি মতে গোরা ভাব ক্ষেত্রে খ্যাত হেলা। প্রতিদিন সংকীর্তন লীলা বিস্তারিলা ॥ ভক্তগণ নেই প্রভু বেড়া সংকীর্ত্তন। নাচিয়া গাইয়া চলে প্লাবিত নয়ন ॥ এক দিনে বটমূলে[৩৩] প্রবেশন কালে। স্তম্ভিত হইল বিশ্বম্ভর স্থির হেলে ॥ ভাগবত বাণী প্রভু কলেক শ্রবণ। কেহ বোলে দেখ দামোদর কুহুঁ জন ॥ স্বরূপ বলিল প্রভু উড়িয়া ব্রাহ্মণ। দাস জগন্নাথের নিজ জন ॥ পুরাণ পাণ্ডা অটই নাথের মন্দিরে। উত্তম সে ভাগ্যবতী ভাব রস সারে ॥ কল্প বৃক্ষ শাখাশ্রয়ে আস্তে বিশ্রামিব। যাও হে ব্রাহ্মণ গুপ্ত বিষয় পুছিব ॥

শব্দার্থ ঃ—তোলি (তাড়ি)—তুলিয়া, বোড়ি—মাখিয়া, সম্প্রদা নিযোগ—পূর্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য (২৯নং টীকা) কুহুঁ জন—কোন জন।

টীকা ঃ—(৩২) 'নাসাগ্রং কেশপর্য্যন্তনং তিলকং হরিমন্দিরম্'* হরিমন্দির তিলকের অর্থ হ'ল উর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' দ্বাদশ তিলকে বিধিতে 'উর্দ্ধপুণ্ড্র' তিলকের বিস্তৃত প্রশস্তি আছে। লেখা আছে– উর্দ্ধপুণ্ড্রধরোমর্ত্ত্যো গৃহে যস্যান্নমশ্নুতে তদা বিংশৎ কুলং তস্য নরকাদুদ্ধরাম্যহম।'

*নাসাদিকেশ পর্য্যন্ত মূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনম্ মধ্যেছিদ্রমমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধবিমন্দিরম্' (পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে)

দেবদাসীরা প্রথমে কনিষ্ঠ রাজগুরু থেকে তিলক ও মন্ত্র গ্রহণ করত। তিলক ছিল 'স্মার্ত্তউর্দ্ধপুণ্ড্র'। কিন্তু দেবদাসী লাবণ্য মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করার পর থেকে সমস্ত দেবদাসীরা আজও কলিতিলক মঠ, নাগামঠ, গঙ্গামাতা ও ঝাঁঝপিঠা মঠ ইত্যাদি গৌড়ীয় মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অনুসরণে মালা ও তিলক ধারণ করেছেন।

(৩৩) শ্রীমন্দির কূর্মবেড়া প্রাঙ্গণে কল্পবৃক্ষের মূলে কল্পগণেশ আছেন তার ঠিক সম্মুখে ভাগবত আচার্য্যের স্থান বিদ্যমান। সেই ঘরে 'অতিবড়ি' মঠের অবস্থান। এখানে অতিবড়িতে জগন্নাথ দাস বিশ্রাম করতেন। তার সামনে ভাগবত পাঠের স্থান বেদীরূপে আছে।

সাষ্টাঙ্গ করিণ ক্ষেত্র দ্বিজপদ ধ্যায়ী। পচার সে রাধা নাম ভাগবতে কাহিঁ নাহিঁ॥ দামোদর ভক্ত শ্রেষ্ঠ তক্ষণে নমিয়া। পুছিলে গুপ্ত ভাব ভাবময় হইয়া॥ শুনি হসি বিপ্র জগন্নাথ কলেক প্রণাম। উত্তম প্রশ্ন করিল হিয়া কম্পাইণ॥ রসভর জগন্নাথ বদ্ধ কর হেলে। তুমে কেহ গুপ্ত প্রশ্ন আন্তক্কু পুছিলে॥ কৃষ্ণসাধ্য সাধক এ জীব নিরন্তর। সাধনা রাধিতা রাধা প্রেমভাব সার॥ রাধা রাসেশ্বরী রম্যা কৃষ্ণমন্ত্রস্থ দৈবতম্। সা বিদ্যা সর্ব্ববন্দিয়াং চ বৃন্দারণ্য বিহারিণীম্॥ বৃন্দারণ্য অটে অনাহত হৃদচক্র। দিব্যজ্যোতির্ময়ী রাধা নিবাস তত্রৈক॥ পরাৎপরতরাং পূর্ণা পূর্ণচন্দ্রা বরাননা। মুক্তি ভুক্তি প্রদাং নিত্যা মূল প্রকৃতি সাপরাম্॥ মূল প্রকৃত্যে পুরুষে তারতম্য নাই। একের অভাবে অন্য সত্তা ন রহই॥ 'রা' বর্ণ দান নিতরাং 'ধা' নির্ব্বাণ প্রদায়িকা। উচ্চারণে মুক্তিশ্চৈব সা হি 'রাধা' প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ রেফ্‌বৈ নিশ্চলা ভক্তি হি লক্ষ্য কৃষ্ণ পদাম্বুজম্। 'ধ' কার সহজা নিত্যাং তত্ত্ব হরিক্ষর দ্বয়ম্॥

রাধা গুণাত্মিকা কৃষ্ণ গুণ বাচক বিগ্রহঃ। গুণাত্মিকা মহাভাব প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণ দৃশ্যবৈ॥ রাধা কৃষ্ণাত্মিকা নিত্যা কৃষ্ণ রাধাত্মক স্বয়ম্। কৃষ্ণ প্রাণগত রাধা প্রাণ ভাগবতস্য চ॥ প্রাণয়েব শরীরস্থ পরাসক্তৈক কেবলম্। শরীরম্ দৃশ্য স সাক্ষাৎ উহ্য প্রাণ সদৈব হিঃ॥ সা হি ভাগবতে উহ্যা, রাস রাসেশ্বরী স্বয়ম্। প্রকট কৃষ্ণচরিত শুক মুখাৎ বিনিসৃতম্॥ যথা গোরা কৃষ্ণতনু রাধা ভাবান্বিত। তথা ভাগবতে কৃষ্ণ (সাক্ষাৎ) রাধা বিরহিত॥ প্রেমী প্রেমাস্পদ দুহুঁ অভেদ্য জগতে। কৃষ্ণলীলা মহাভাব প্রেমের সহিতে॥ রসেশ্বর উহ্য প্রেম অপ্রকট ভাব। দাহিন প্রকটি রাম লীলার স্বভাব॥ রাধা নিধি কৃষ্ণ চিন্তামণি নাম ধরে। গুপ্ত গুপ্ততম তত্ত্ব অনুভব সারে॥ বারে যদি রাধা নাম ভাগবতে আসে। রাধা লীলামৃত নাম হেবতা প্রকাশে॥ "হরিমেক রসম্ চিরমপি বিহিত বিলাসম্"*। রসাধার রাধা অপ্রকট অপ্রকাশ্য··· ॥

শব্দার্থ:—পচার—জিজ্ঞাসা করা। দাহিন—দক্ষিণ, হেবতা—তা হবে

* 'গীতগোবিন্দ'

দূরে প্রভু অদ্‌ভুতে হুঙ্কার করিলে। 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া প্রভু মুরছিত হেলে॥ কেহ তু'হু ক্ষেত্র দ্বিজ মহাভাবময়। শীতল করিল হিয়া ভাব কল থয়॥ সে হি দিনু প্রতিদিন উভয়ে মিলন্তি। কোলাকুলি হোই লভি ভাগবত প্রীতি॥ পুনঃ জগন্নাথ বিপ্র বোলে, শুন গোরা রায়। শ্রীক্ষেত্রে রাধার পূজা নাহিঁটি নিশ্চয়॥ রাধা হৃদ্‌গত ভাব স্তম্ভর প্রমাণ। রাধা অনাহত জ্যোতি প্রীতি ভাব জান॥ রাধা আহ্লাদিনী শক্তি পৃথক নোহে[৩৪] সেহি। কৃষ্ণপ্রীতি জ্যোতিরূপে চক্রভার বহি॥ রাহাস মণ্ডল চক্র স্বয়ং সুদর্শন। রাধাষ্টমী দিন তার থয় আরাধন॥ অশ্রু কম্প স্বেদ পরে রোমাঞ্চ শরীর। স্তম্ভাবস্থার স্বরূপ চক্র নিরন্তর॥

শব্দার্থঃ—স্তম্ভর—নিশ্চল, অচল। রাহাস—রাস

টীকাঃ—(৩৪) 'যদস্যাম্ কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেক কেবলমুত্তমঃ
সর্বভাবোদ্গমোল্লাসি মাদনোয়ং পরাৎপরঃ
রাজতে হ্লাদিনীসার রাধায়ামেব যঃ সদা'

বিভাব ভাবর চক্র প্রতীক অটই। যাহা দেই রতি ভাব হাদে প্রকটই ॥ আস্বাদন রস সার রাধাতত্ত্ব যেনু। রাধাষ্টমে দিন তার ভ্রমণিটি তেনু[৩৫] ॥ বিভাব্যতে হি ইত্যাদি যত্র যেন বিভাবতে। কৃষ্ণর বিভর খ্যাত ভাবব জগতে॥ বিভাবে নষ্ট নুহই বিভেতি নিশ্চিতে। রাধানন্দময়ী সাক্ষাৎ সর্ব্বাপদবিনাশিনী ॥ "যতো বাচ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহঃ। আনন্দো ব্রহ্মনো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চনঃ ॥" নারায়ণ সহ তার চক্রাত্মক রাস মণ্ডল। জগন্নাথের প্রেম শক্তি স্তম্ভরূপ হেলে[৩৬] ॥ সুদর্শন সুদর্শনা রাধা প্রেম জান। রাধাষ্টমী বিধি যার তত্ত্বর প্রমাণ॥ এহি মত নানাভাবে নিত্য আলাপন। শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ হেলে এক মন॥

শব্দার্থঃ—অটই—বটে, ভ্রমণিটি—পরিক্রমা উৎসব, তেনু - তেমন, নষ্ট নুহই—নষ্ট হয় নি।

টীকাঃ—(৩৫) সিংহাসনোপরি অধিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথজীউ বামদিকে স্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত সুদর্শন, রাধাষ্টমীর দিনবেড়াকীর্ত্তনসহ নগর পরিক্রমায় যান। পরিক্রমান্তে সমুদ্রতটে শ্মশানের কাছে যমেশ্বর মহাদেব ও গদাধর পূজিত টোটা গোপীনাথের মাঝখানে স্থাপন করা হয়। জগন্নাথ মন্দিরের বড় পাণ্ডা স্বয়ং মাদলা পাঞ্জী থেকে সমস্ত বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন। শ্রীরাধিকার প্রতিনিধিস্বরূপ স্তম্ভরূপধারী শ্রীসুদর্শন সর্ব-অধিশ্বরীর পক্ষে এই আয় ব্যয় শ্রবণ করেন। এইটিই রীতি। আজও অনুসৃত।

(৩৬) 'সুদর্শন মহাজ্বালা কোটি সূর্য্যসমপ্রভম্' এই বাক্য সুদর্শন চক্রের বিষয়ে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। মহাভাবতত্ত্ব সূর্য্য তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই বাক্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত—'সূর্য্য ইব সম্বন্ধি জনমাত্র এবম্ স্বভাব সম্পর্ক যদ্ভাবেরতি তদা মহাভাব'। সেই মহাভাবে অধিরূঢ় অবস্থার প্রতীক সুদর্শন স্তম্ভরূপে বিরাজিত।

কতক পার্শ্বর এহা সহি ন পারন্তি। উড়িয়া ব্রাহ্মণে প্রভু পিরতি করন্তি॥ চৈতন্য কহিলে এ যে ক্ষেত্র দ্বিজবর। ভাগবতী জগন্নাথ প্রিয়তম নর॥ রাধাভাবে রায় মোর অতি প্রিয়ঙ্কর। জগন্নাথ ভাগবতী ক্ষেত্রর ভূষণ। মোর নিত্যদাস ভাব তা ইষ্ট প্রমাণ॥ নিত্য ক্ষেত্রে কল্পতরু তলে ভাগবত। পড়ই ভাবরে তাঙ্কু কর দণ্ডবত॥ হস্ত জোড়ি জগন্নাথ দিনে নিবেদিলে। তুম্ভর উত্তম দাস অছি ক্ষেত্রবরে॥ হরিবংশ পুরে এক সন্ন্যাসী অছন্তি[৩৭]। সৌরী গোস্বামী, গৌরী অনুজ অটন্তি॥ সেই স্থান বিজে কর প্রেম রস তহিঁ। চর্চ্চা করন্তি নিত্য সে গৌড়ীয় গোসাই॥ এহা শুনি প্রভু গোরা মহাসুখি হেলে। তান্তর অগ্রজ গৌর গোসাইঁ ভেটিলে॥

শব্দার্থ:—পিরতি—প্রীতি, তুম্ভর -তোমার, অছি—আছে, অছন্তি—আছেন, অটন্তি—বটেন, বিজে—বিচরণ করে। পার্শ্বর—পার্ষদ

টীকা:—(৩৭) পুরী সহরের প্রাচীন বসতির ভিতরে কুন্তাই বেটসাহি এর প্রাচীন নাম হরিবংশপুর। সেই স্থানে পণ্ডিত গৌরীদাস গোস্বামী (সর্খেল) এর অগ্রজ সৌরী গোস্বামী বাস করতেন। সেই মঠের নাম আহুল্যা মঠ। আহুল্যা শব্দের অর্থ বৈঠা। গৌরীদাস পণ্ডিতের অভিমান ভাঙ্গাবার জন্য শান্তিপুর থেকে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ নৌকা বেয়ে এসে ভবপারের উপায়স্বরূপ হরিনামের প্রতীক রূপে নিজের বৈঠাখানি দিয়ে যান। সেই বৈঠার একখানি আজও কালনার শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের পাটবাড়ীতে পূজিত হচ্ছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সৌরীদাস গোস্বামীর কুটিরে পদার্পণ করলে তিনি ঐ বৈঠা প্রদানের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর ঘরে ঐ বৈঠা আজও পূজিত হচ্ছে। পুরীয় আহুল্যা মঠে আর একটি বৈঠা আজও পূজিত হচ্ছে। সেই কারণে এই মন্দিরের নাম আহুল্যা মঠ। নরহরি দাস ঠাকুর রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

নদীয়া নিবাসী সৌরী গোস্বামী সুধীর। পুরুষোত্তম দেবঙ্ক[৩৮] অতি প্রিয় নর॥ তাহাঙ্ক দরশন করি প্রেম ভাবখনি। কাঞ্চনের যোগ করি প্রেম ভাব মণি॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈতঙ্কু সঙ্গরে ঘেনিলে। হরিবংশ পুর হেরা গোহরী গলিরে॥ রাজা প্রিয় সৌরীদেব অতি মিষ্টভাষী। চৈতন্যঙ্কু দেখি মাতা পিতা পরশংসি॥ চৈতন্য বসিলে জগন্নাথঙ্ক ছামুরে। চৈতন্যঙ্কু আনমনা দেখি ভক্ত নরে॥ কি চিন্তা করুছ হে সন্ন্যাসী ছাড়িত আসিছ। পুনাতি ভুবন এয় ব্রত আচরিছ॥ আস গম্ভিরিরে কিছি লুচাই রখিছি। দেখি প্রীত হেব নিশ্চয়ে ভাবিলই ইচ্ছি॥

শব্দার্থঃ—হেরা—দেখা, গোহরী—ছোট রাস্তা, পরশংসি—প্রশংসা করলেন, ছামুরে—সম্মুখে, ছাড়িত আসিছ—ছেড়ে এসেছ, গম্ভিরিরে—ঘরের মধ্যে গুপ্ত ঘর, কিছি—কিছু।

টীকাঃ—(৩৮) গজপতি পুরুষোত্তম দেব রাজা প্রতাপরুদ্রের পিতা ইনি প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। নিত্যগুপ্ত চূড়ামণি, 'অভিনব গীতগোবিন্দ' 'অভিনব বেণীসংহার' রচনা করেছিলেন।

গম্ভিরী ভিতরে নেই সৌরী গোসাই। অন্ধকারে দেখাইল ভাব অনুজাই (অনুযায়ী) ॥ অন্ধকারে আলুয় প্রায় শচী মাতা রূপ। দেখিলে যে মনে গৃহে তেমন্ত স্বরূপ। চুম্বিলে জননী মুখে নিমাইঙ্ক ধরি। বোইলে দেখিল নেত্রে নয়নে না ধরি ॥ আকুল বদনে সৌরী কর ধরি আসি। মিলিলেক নিত্যানন্দ পাদ পাশে বসি ॥ বোইলে ভো দেব আমি বুঝি না পারিল। অপূর্ব দরশন করি কৃতার্থ হইল ॥ অদ্বৈত কহিলে এত সিদ্ধময় ভূমি। নো হে যোগ[৩৯] সিদ্ধি এহা নাম সিদ্ধি জানি। এই স্থানে দেখ এক পূজিত ঠাকুর। জগন্নাথ সহ দেখ আহুলা কৃষ্ণের ॥ জগত তারক নাম মন্ত্র পিঠে যাই। মহামন্ত্র আহুলার পূজন হুয়ই। শচীসুত সেহি ঠারে রহি কিছি দিন। অদ্বৈত সীতা দেবীকু ঘেনিন বহন ॥ মেঠাবে করিলে লীলা প্রকাশ ত্বস্তর। মাতা গোসাইঙ্ক মঠ তীর্থ মধ্যে সার ॥ দেখি গোরা সিংহাসনে আহুলা কাষ্ঠর। মহামন্ত্র স্মুখোদিত পূজন সম্ভার ॥

সৌরী কহিলে আহে পাবনাবতার। মোর ভ্রাতৃদেবের আগে ভেটিছ বিচার ॥ দেইথিল মনে থিব নদীয়া লীলারে। গৌরী গোস্বামী ন্যাসী ভেটি একবারে ॥ আহুলা কাঠর দেই মহামন্ত্র দেল। আন্তর কুল দেবতা আহুলা হইল ॥ ভবসাগরে উড়ুপ অটন্তি আপন[৪১]। মহামন্ত্র আহুলারে মুক্তির কারণ ॥ আহুলা মঠরে প্রভু একান্তে রহিলে।

শব্দার্থ ঃ—অন্ধারে—অন্ধকারে, আলুয়—আলো, যেমনে—যেমন। আহে—অহো, দেইথিল—দিয়েছিল, মনে থিব—মনে আছে, উড়ুপ—নৌকা, অটান্ত--বটেন।

টীকা ঃ—(৩৯) কবির রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে যেখানেই কোন বঙ্গদেশীয় চরিত্র আসছে বা তার উক্তি উদ্ধৃত হচ্ছে সেখানে বাংলা ক্রিয়াপদ ব্যবহার করছেন।

(৪০) এইখানে ধ্যান-চিন্তনে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু শচীমাতাকে দর্শন করায় এই মঠের নাম 'মাতা গোসাইঙ্ক মঠ'। কারো কারো মতে এইখানে সীতা দেবীর দারবিগ্রহ পূজিত।

(৪১) ৩৭নং টীকা দ্রষ্টব্য

কুঞ্জমঠ তোটা সার্বভৌমাদি খোজিন। কাহিঁ গলে ত্রিমূর্ত্তি সে আকুলিত মন॥ আহুলা মঠরে জাই দর্শন করিলে। হেরোচ্ছবকু[৪২] সর্ব্বে আসিব বোইলে॥ 'হরেকৃষ্ণ' নাম আহুলাকু ওলগি হুয়ন্তি। ···বোলিয়া অগ্রজ তুম্ভে নাম দণ্ড ধারী। এই পিঠে থীবাকু এ আদিস্থলী বারি॥ অদ্বৈত ঠাকুর এঠি বিরাজিত হোই। মাতা সীতা গোস্বামীঙ্ক এ মঠ অটই॥ চারিমাস সে হি স্থলে গোরা বাস কলে। কাশীমিশ্রালয়ে পুন গমন করিলে॥ পুন ভাব গদগদ অষ্টকাল লীলা হেলা। চারিমাস গম্ভিরারে নাম পচারিলা॥ শ্রাবণ পূর্ণিমা দিন অকস্মাতে উঠি। প্রভু চলে পুরী গোস্বামীর পর্ণ কুটি। বাসলি সাহি তোটারে[৪৩] বৈষ্ণবঙ্কু ঘেনি॥ নিত্যানন্দ গোরা তহিঁ প্রবেশিল বেনি। পরমানন্দ পুরী যে আনন্দিত হোই॥ বিশ্বম্ভরে বসাইল দিব্যাসন দেই॥

শব্দার্থঃ—হেরোচ্ছব—একটি উৎসবের নাম, লক্ষ্মীকে দর্শন করা হয় বলে হেরা উৎসব বলা হয়। ওলগি—নমস্কার, প্রণত, হুয়ন্তি—হন, থীবাকু—আছেন, বারি—বলে, বাসনি—বাশুলি দেবী, সাহি—পল্লী, তোটা—উদ্যান, বেনি—দুজনে।

টীকাঃ—(৪২) আষাঢ় মাস শুক্লপঞ্চমী তিথিতে জগন্নাথ মন্দিরের মহালক্ষ্মী প্রতিমা (কনক লক্ষ্মী) জগন্নাথকে দর্শন করবার জন্য গুণ্ডিচা মন্দিরে যাত্রা করেন। আর সেই শোভাযাত্রাকে 'হেরোচ্ছব যাত্রা' বলা যায়। 'উড়িয়া'তে 'হেরা' অর্থে দেখা। সেই হিসাবে একে 'হেরাচ্ছব' বলা যায় আর কেউ বলে 'হরা' মহালক্ষ্মীর অপর নাম।

(৪৩) পুরী সহরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাসলি (বাশুলি) দেবীর মন্দির থেকে লোকনাথ মহাদেবের মন্দির পর্য্যন্ত অঞ্চলের নাম ছিল 'বাসলি সাহি তোটা'। সেই লোকনাথ মন্দির মর্গে যেথানে আজকাল বাসলি সাহি আউট পোষ্ট আছে সেখানে পরমানন্দ পুরী গোস্বামীর নিবাস ছিল। সেখানে যে কূপ আছে সেই কূপের জলকে আজও সমগ্র উড়িষ্যাবাসী গঙ্গাজল স্বরূপ মান্য করেন।

চারিদণ্ড নাম-রসরে কটি গলা। তৃষ্ণা করে জল দিয় প্রভু যে ভাষিলা॥ জল পাই মাধবকু দূরে পঠাইলে। প্রভু বলে 'দেহ জল' বিলম্ব ন কর॥ শুনি বাবা হেলে অতীব কাতর। বোইলে হে প্রভু ক্ষার জল ন জোগাই। পঠাইছি দাসে মুই অন্য জল পাইঁ॥ প্রভু উঠি কূপ খাতে নিরখিল বারে। কীর্ত্তন করিণ পরিক্রমি তিনি বারে॥ আস মাতা শ্বেত গঙ্গা দেবী ভোগবতী। বৈষ্ণব আশ্রম-বাসী হয় ইয়ার কতি॥ দণ্ড প্রণাম করিণ প্রভু প্রণমিল। গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা নাম রটিতে লাগিল॥ বোইলে সে বিশ্বম্ভর পুরী মহারাজ। তৃষ্ণাতুর ত্রহি জল পিইবক আজ॥ গোবিন্দ দাসে কাড়িলে গঙ্গা জল কূপু। পিই সেই বিশ্বম্ভর প্রমোদিত বপু॥ বিশ্বনাথ প্রতিহারী, মহাপাত্র পদ। দর্শনে সাহি নায়ক[৪৪] অতীব আনন্দ॥ গঙ্গাজল প্রায় জল পিইলে গোসাইঁ। বৈষ্ণব সকলে জল পানে তোষ হই॥

শব্দার্থঃ—রসরে—রসে, ভাষিলা—বললেন, ক্ষার—নোনা, লবণাক্ত, ন জোগাই—যোগ্য নয়, পিই—পান ক'রে

টীকাঃ—(৪৪) পুরীর প্রাচীন শাসন পদ্ধতিতে পুরী সাতটি মণ্ডল বা সাহিতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সাহিতে একজন সাহিনায়ক থাকেন। সেই সাহিনায়কের মাধ্যমে, সেই অঞ্চলের রাজকীয় দান, পূজা, পার্বণ ও সর্বসাধারণের জন্য অনুষ্ঠানাদি পরিচালিত হয়।

କ୍ଷାରଜଳ ଗଙ୍ଗା ହେଲା ନାମର ପ୍ରଭାবେ। রাজার সমীপে শ্রীকরণ বখানিল[৪৫] ভাবে॥ পুরী গোসাইঁব স্থান দেখি নরপতি। পাঞ্চ বাটি ভূই খঞ্জা দেলা মহামতি॥ নিত্য সেহি জল সেবা কলে ক্ষেত্রজন। চৈতন্য মহিমা প্রকটিল দিনু দিন॥ দেউল করণ প্রভু আসবে মিলিলে। রঘুনাথ দাস তাঙ্কু কঠী শাড়ী দেলে॥ করণ কহিলা প্রভু মহাজন। এ ক্ষেত্র মহিমা পুণ অত্যন্ত গহন॥ কবি দিণ্ডিম জীবদেব গ্রহরাজ রাজগুরু। বিশদে জানন্তি গোদাবর রাজগুরু॥ এথানে কীর্ত্তন পথ শ্রেয়ঃ ন মনন্তি। প্রভুঙ্ক ভাবকু মাত্র গম্ভীর মনন্তি॥ রামানন্দ পট্টনায়ক যে মহাজন॥ নিত্যকৃষ্ণ রত সে হি সেহ অতি গরিয়ান্॥ গোদাবরী মণ্ডলরে মহা মাণ্ডলিক। সকল ভক্তি রসরে অতি সুবিবেক। ভবানন্দ করণর সে বড় সন্ততি॥ গীত গোবিন্দ গানরে আস্বাদনে মতি।

শব্দার্থঃ—বখানিল—কহিল, ব্যাখ্যা করিল, খঞ্জা—পুরস্কার স্বরূপ বৃত্তি, দিনু দিন—দিনে দিনে, দেউল করণ—জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান কর্মচারী, শাড়ী—শিরপা বস্ত্র। জীব দেব—ইনি প্রতাপরুদ্রের প্রধান রাজগুরু, কবি দিণ্ডিম তার পদবী। গোদাবর রাজগুরু—ইনি দ্বিতীয় রাজগুরু।

টীকাঃ-(৪৫) এই সকল উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যজীবনের বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন এবং সেই লীলা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে ও লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতে যোগ্য ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত করেছেন। ভূমিখণ্ড, রাজস্ব ছাড়, করমুক্ত ফলশোভিত উদ্যান (তোটা) প্রভৃতি দান করেছেন, এখানে তারই একটি প্রমাণ। শ্রীবৈষ্ণবদাস রচিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্য চকড়া' নামে পুঁথিতে এমনি দানের কোন উল্লেখ নেই। গ্রন্থটিখণ্ডিত।

গোপীনাথ বড় জেলা বিষয়ী বোলাই। সর্ব্বে রাজা বরতনে শ্রেষ্ঠী পদ পাই ॥ কৃষ্ণ রস রসে নিত্য রামানন্দ ভোল। পলঙ্ক পোখরী[৪৬] তটে নাটক রচিলা ॥ অভিনয় করি জগমোহনে রসিক। ভক্তি বৈভবু[৪৭] মধ্য খ্যাত কলে লোকে ॥ ন্যাসী ক্ষেত্র বাসী মিলি রাহাস গাআন্তি। বৈষ্ণব রসরে (রামানন্দ) রায় অতি শুদ্ধ মতি॥ সার্বভৌম গোসাইঁ যে তার নাম কহি। দক্ষিণ দেশকু প্রভুরে দেলেক পঠাই॥ চিলিকা পথরে ধরি কীর্ত্তন মণ্ডলী। আসিকা নগরে রহি, পন্তা বাটস্মরি॥ ঋষি কুল্যা তটে কলেক বিশ্রাম। শ্রীকূর্ম যে নাগাবলী আদি ভূমি জেত॥ সংকীর্ত্তন নাম ঘোষে তারিল সে তেতে॥ প্রভুর মণ্ডলে রায় রামানন্দ বীর। ভেটিলে কীর্ত্তন দল অতি ভাবাতুরে॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মাহা বাহু প্রজন্যভয়ভঞ্জনম্। কীর্ত্তন শুনিয়া প্রভু প্রহসিত মন ॥ রামানন্দ শ্রীচরণে পড়ি ভাবাবেশে। কেলি কৈল শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের আবেশে ॥ কি সাধন করুছ তহ ভক্তঙ্ক প্রধান। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি গায়ন মোহর সাধন ॥

শব্দার্থঃ—রাজাবরতনে—রাজার অধীনে, পোখরী- পুকুর, রাহাস—রাস, চিলিকা—চিল্‌কা হ্রদ, আসিকানগর—গঞ্জাম জেলার একটি ছোট সহর, পন্তা—নদী বা সমুদ্রের তট ভূমি, ঋষিকুল্যা—দক্ষিণ উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ নদী, নাগাবলী—নদীর নাম, জেতে—যত, তেতে—সেই স্থানে, যে—এবং, মোহর—আমার।

টীকাঃ—(৪৬) শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের পিছন দিকে যে পুষ্করিণীটি আছে সেই পুষ্করিণীর নাম 'পালঙ্ক পোখরী'। এই পুষ্করিণী তটে শ্রীজন্নাথের প্রতিনিধি শ্রীমদনমোহন, লক্ষ্মীদেবী বহির্যাত্রায় এসে প্রতি বৃহস্পতিবার যে একাদশী পড়ে সেই দিন একান্তে শয়ন করতে আসেন। তখন সেই পুষ্করিণী তটে বহির্যাত্রার

একোপি কৃষ্ণস্য কৃতম্ প্রণাম। নাই অন্য গতি মোর সর্ব্ব কৃষ্ণ নাম ॥ যুগল রসরে শ্রেষ্ঠ রাধা ভাব সার। বচনে প্রভুর হেলা রোমাঞ্চ শরীর ॥ দৃঢ়াভক্তি উক্তি শুনি চৈতন্য ভাব রে। কোল কলে রায় বক্ষে জড়াইল তারে ॥ ঠাকুর বোইলে জগন্নাথ নিত্য ধাম। পূর্ণ ভাগবত ভূমি তহিঁ আন্ত ঠাম ॥ তুই জাই সে ঠাবরে রস সুধি-শ্রেষ্ঠ। পুরুষোত্তমরে লীলা রচিবি গরিষ্ঠ ॥

শব্দার্থ ঃ—সে ঠাবরে—সেই স্থানে।

অভিনয়াদি অনুষ্ঠিত হয়। এই 'জগন্নাথবল্লভ মঠ' রায় রামানন্দের লীলাভূমি। শ্রীরায়রামানন্দ রচিত 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের পাণ্ডুলিপি পণ্ডিত সদাশিব রথশর্মাজীর সংগ্রহে পুরীর রঘুনন্দন পুস্তকালয়ে সংরক্ষিত আছে। এই পুঁথিতে রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুর কথোপকথনের রঙীন রেখাচিত্র আছে। ঐ চিত্রের অনুসরণে ঐতিহাসিক শ্রীজগবন্ধু সিং একটি প্রস্তরমূর্ত্তি নির্মাণ করে জগন্নাথবল্লভ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছেন ১৯৩৮ সালে।

(৪৭) কবি দিণ্ডিম জীবদেব গ্রহরাজ মহাপাত্র রাজগুরু 'ভক্তিবৈভব' নাটক 'শ্রীমদ্ভাগবত' অনুসরণে রচনা করেছেন যেখানে বৈষ্ণব দর্শন বিধৃত হয়েছে পাত্র-পাত্রী রূপে। এই গ্রন্থটিও পণ্ডিত রথশর্মাজী আবিষ্কার করেছেন এবং উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এতে কহি ঠাকুরে যে দক্ষিণে চলিলে। রামানন্দ বুড়া লেঙ্কা ক্ষেত্রে পাঠাইলে॥ ক্ষেত্রের চরিত সর্ব্ব মুখে প্রচারিলা। বুড়ালেঙ্কা জাই রাজা ছামুরে জনাই॥ চৈতন্য ঠাকুরে থীলে ন চিন্তিলে কেহি। পাবন নাম প্রচারে পতিত পাবন॥ তাহার সমীপে নৃপ রখন্ত যে মন। আঠ মাস সংবৎসর পুছাই ঠাকুর॥ পুনঃ বিদ্যানগর রে নামর প্রচার। ডগরা কহিলা মিলি কীর্ত্তন পথরে॥ চলন্ত ভো দেব বেগে ক্ষেত্র বরে। উৎকণ্ঠিত প্রভু তথি ঘাটী মান দেই॥ ব্রহ্মগিরি পথে তথি উপস্থিত হোই।

শব্দার্থঃ—বুড়া লেঙ্কা—রাজনৈতিক রাজ কর্মচারী, বিদ্যানগর—বিজয় নগর, ডগরা—সরকারী ডাক হড়করা, ঘাটী—গিরিখাদ, দুটি পর্বতের মধ্যে রাস্তা, মাল—জঙ্গল।

অলাল নাথক[৪৮] দেখি ভাবে প্রণমিলে। কৃষ্ণ নারায়ণ সাক্ষাত ভেদ ন দেখিলে॥ গৌড় ভক্তগণ শুনি করিলে আগমন। স্বরূপ দামোদরের পুলকিত মন॥ কাশী মিশ্র গৃহ তোটা কৃষ্ণের মন্দির। নির্মাণিল পথুরিয়া গম্ভিরী সুন্দর[৪৯]॥ প্রভু দেখি তাহা অতি প্রমোদিত মন। (উৎসব) উচ্ছব রচিল সর্ব্ব বৈষ্ণব প্রধান॥ হরিদাস তোটা দাড়ে কুটির রচিলে। বক্রেশ্বর সেহি তোটা মধ্যে বাস কলে॥ বৃদ্ধ গোদাবর[৫০] মহামতি এহা দেখি। প্রচলন ব্যতিক্রমে হেলে সদা দুঃখী॥ ভক্তি ভাগবত কৃষ্ণ লীলা ভাব শুনি। বিচারিলে স্মার্ত্তভাব মলিন হেলানী॥

শব্দার্থঃ— দাড়ে—পার্শ্বে হেলানী—হইল

টীকাঃ—(৪৮) পুরী জেলার **ব্রহ্মগিরি** এক প্রাচীন স্থান। ব্রহ্মা শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করবার পর এই পবিত্র স্থানে অবস্থান করেছিলেন। সেজন্য এই স্থানের নাম ব্রহ্মগিরি। ব্রহ্মগিরির অদূরে 'অলালপুর' বলে এক গ্রামে অলাননাথের প্রাচীন মন্দির আছে। সেই মন্দির শ্রীভাষ্যকার রামানুজাচার্য্যের সময় থেকে প্রতিষ্ঠিতা। শ্রী সম্প্রদায়ের উক্ত মন্দিরের নারায়ণ মূর্ত্তিকে 'অলবন্দার' বলে। কারণ তাদের ২৪তম গুরু অলবন্দার নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু মনে হয় অলালপুর গ্রামের নামেই এই ঠাকুরের নাম 'অলালনাথ' হয়েছে। এই মন্দিরে সপ্ততাল বিশিষ্ট নারায়ণ মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

(৪৯) এই সময়ে শ্রীকাশীমিশ্র নিবাসে প্রস্তর নির্মিত ছোট গম্ভিরী মন্দির শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিবাসের জন্য নির্মিত হয়েছিল। এবং তার পার্শ্বদেশে রাধাকান্ত বিগ্রহের জন্যও মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেইদিন থেকে 'গম্ভীরা রাধাকান্তের মঠ' বলে বিখ্যাত।

(৫০) গজপতি পুরুষোত্তম দেবের বরিষ্ঠ রাজগুরু রচ্ছন গোত্রীয় মহাসামন্ত গোদাবর মিশ্র রাজগুরু যিনি সেই সময়ে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বিদ্বান ছিলেন। 'হরিহরচতুরঙ্গ', 'যোগচিন্তামণি', 'মন্ত্র চিন্তামণি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রণেতা।

রাজাজ্ঞা নেইণ মহতরে ত্যাগ কলে। সারিয়া তটরে গ্রাম এক সংস্থাপিলে॥ তুম রায় পুট[৫১] নামে করিণ শাসন। গমিলে স্থবির সর্ব্বজন পূজ্য জন॥ রায় রামানন্দ ক্ষেত্রে আসি লীলা দেখি। হোইলে গৌরাঙ্গ পদে নিত্য মহা সুখি॥ জগন্নাথ বল্লভরে মিলিলেক গোরা।

শব্দার্থ ঃ—নেইন—লইয়া, মহতরে—মাহাত্ম্য পূর্ণভাবে।

টীকা ঃ—(৫১) পুরী জেলার বাণপুর থানা প্রতাপ গ্রামের দক্ষিণে 'সারিয়া' নদীর তটদেশে 'তুমরায় পুট' ব্রাহ্মণশাসনে গোদাবর রাজগুরু বংশজ সামন্তগণ বর্ত্তমানেও বাস করেন। উৎকল প্রদেশের রাজপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মন গ্রামকে শাসন বলা হয়। শাসনের মধ্যে ব্রাহ্মন গোষ্ঠীর বসতি। দুই পাশে শিব দুর্গার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে রাজারা ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণেরা রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও পরামর্শদাতা ভাবে ইতিহাসে পরিচিত। পুরীর মুক্তিমণ্ডপে কেবল এই শাসন গ্রামবাসী ব্রাহ্মণদের বসার জন্য পৃথক মণ্ডপ আছে। সেখানে অন্য কেউ বসতে পারে না। এঁরা অধিকাংশই বেদজ্ঞ পণ্ডিত। শাসন গ্রামবাসীদের বিষয়ে আপ্তবাক্য প্রচলিত আছে —"শান্তি সদাচার নরাত্মভাবঃ স শাসনঃ ভূসুরোবাসভূমি"।

প্রতাপ রুদ্রর ভাব ভকতি লক্ষণ। দেখি প্রভু প্রেমভাব রখি বিলক্ষণ॥ গোপিনাথ পাট পাত্র বড় অলি কলা। বালি নবররে[৫২] নৃপ মিলিবা ইচ্ছিলা॥ বোইলেকি বিশ্বম্ভর বিষয়ী প্রধান। তাহাঙ্ক সাক্ষাতরে মোর কিবা প্রয়োজন॥ জগন্নাথ নিজ দাস এথি নাহিঁ শঙ্কা। মাত্র তোর রাজা অটে অতি যুদ্ধ রঙ্কা॥ গজপতি কীর্ত্তি শুনি মিলনে ব্যাকুল। রায় রামানন্দ সঙ্গে করিল বিচার॥ রায় বোলে ছামুঙ্কু মু নেই ভেটাইবা। গুপত বেশরে তুহুঁ দেউলকু জিবা॥ শুক্ল বস্ত্র পুহারন পিন্ধি নরপতি। রায় সঙ্গে দেউলরে প্রবেশিল তথি॥ জগমোহনরে তুহুঁ ভাবে বিরাজিলে। গুপত বেশরু কেহি জানি ন পারিলে॥

শব্দার্থঃ—পাট পাত্র—মুখ্য রাজকীয় কর্মচারী, অলিকলা—একান্ত অনুরোধ, বালি নবররে—প্রতাপরুদ্রের পুরীস্থ নিবাস, ভেটাইবা—সাক্ষাৎ করান, পুহারণ—উত্তরীয়, পিন্ধি—পরিধান করে, রঙ্কা—আগ্রহী ।

টীকাঃ—(৫২) পুরীর বালিসাহি অন্তর্গত এক প্রাচীন নগর। সেই নগরে গঙ্গবংশীয় গজপতি পুরুষোত্তম দেব রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। সেইখানে শ্যামাকালী দেবীর মন্দির ও রাধাকৃষ্ণের মন্দির গজপতির সময় থেকে ছিল। রাজা প্রতাপরুদ্রের পরে সেখানে চৈতন্য মহাপ্রভুর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতাপরুদ্র এই মন্দিরের নির্মাতা নন। সেই শাক্ত পরম্পরায় প্রতাপরুদ্র দেব গজপতি পুরুষোত্তম দেবের পরম্পরা রক্ষা করে খোর্দা স্টেশন নিকটবর্তী খিলেশ্বর মন্দিরের শিলালিপিতে নিজের পরিচয় লিখেছেন তাঁর বরপুত্র বলে।

এ সময় বেড়া সংকীর্ত্তন মাঝে প্রভু। ভাবাবেশে রূপ তার শোভা কে বর্ণিবু॥ উদ্দণ্ড ভুজ বিস্তার নয়নাশ্রু পূর্ণ। হরেকৃষ্ণ নাম ঘোষ হুয়ে উচ্চারণ॥ নিত্যানন্দে পাশে তার সে জ্যেষ্ঠ মুরতি। গম্ভির ধবল-তনু করে শৃংঘা ধৃতি॥ বেড়া সারি তিনি বার সাত পাবচ্ছরে। বিরাজন্তে রায় দেখাইল ভাব ভরে॥ জ্যেষ্ঠ শুক্ল দশমীর শুভ তিথি যোগ। দর্শনে দেখিলে রাম রূপর বৈভব॥

পশ্যন্ত রাজ রাজেশ জগন্নাথ পরায়ণন্। সাক্ষাৎ নামাবতারম্ হি বিশ্বম্ভর শুভাননম্॥ রাজা হেরিল বিচিত্র রূপ সমাহার। হরে কৃষ্ণ রাম তিনি তত্ত্ব লক্ষণ নিকর॥ ত্রিভঙ্গ স্থান সংস্থানম্। গৈরিক বসন বাসনাভৃতম্॥ নানাবরণ সৌভাগ্যম কমনীয় মুখাম্বুজম্। পীতবর্ণ বপুন্যাসী দণ্ড কমণ্ডলু ধরম্॥ হরের্নাম ইতি তত্র তদূর্দ্ধে দেবকী সূতম্॥

হৃদয়ে শ্যাম বর্ণাড্যম্ বংশী করৌ বিভূষিতম্॥ কৃষ্ণ রূপাৎ পরে রামম্ ধনুর্বাণ করান্বিতম্॥ 'হরে কৃষ্ণ নামম্' ইতি পাদাৎ শিরাবধি। প্রপন্ন পারিজাতায় গৌরসুন্দর তে নমঃ। এহি মত চুহ্ জন প্রণাম করিলে। অন্তে দ্বিভুজে সন্ন্যাসী রূপ প্রকাশিলে॥ ষড়্ভুজ যন্ত্র সহিত এয় নাম প্রকল্পিলে। ষোড়শ নাম রে ষোহল স্তম্ভ[৫৩] বিচিন্তিলে॥

ষ্ণ
রা কৃ
ওঁ
ম রে
হ

শব্দার্থ :—শৃংঘা—শিঙা, পাবচ্ছরে—জগমোহন মন্দিরাংশে উত্তর দিকের প্রবেশ পথ।
ষোহল—ষোল

টীকা :—(৫৩) জগন্নাথ মন্দিরে জগমোহনে শিল্পশাস্ত্র মতে ষোলটি স্তম্ভ বিদ্যমান। আধ্যাত্মিক ভক্তরা মনে করেন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের অনুসরণে ষোলটি স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে।

ষড়ভুজ গোরা তঁহি প্রকাশ করিলে। সাক্ষাত বিষ্ণুর অংশ বোলি স্থির কলে॥ পট্টজ্যোতি ন্যায় বন্ধু হকারী কহন্তি। যাহা দেখিল এ ঠারে অপূর্ব্ব শকতি॥ যেবে এ মোহন কর্ম্ম হেব সমাপিত। ভোগমণ্ডপরে মুরতি হোইব স্থাপিত॥ মধ্যে চৈতন্য ঠাকুর দক্ষে নিত্যানন্দ। বামে সেবক বিধিরে আত্মরূপ দেব॥ দণ্ড ছত্র আদি থীব বিধিরে রচনা। জগতে নাম তত্ত্ব যে হোইবক ঘেনা॥ চাল রায় ধীর সাক্ষাতরে নাহি লোড়া। দিয় তাঙ্কু আপি এবে খণ্ডুআ পাছড়া॥ বালি নবরকু যাই সকলে হকারী। অপূর্ব্ব দর্শন কথা কহিলে বিস্তারী॥ সে আন্তর পিতা মাতা গুরু যে অটন্তি। কাশী মিশ্র বড় গুরু নাহি এথি ভ্রান্তি॥ মাত্র সিংহাসন সেবা তাঙ্কু ন জোগাই। গীত গোবিন্দ আজ্ঞা কি শ্রীমুখে কাটই॥

মাত্র সংকীর্ত্তন পতি গম্ভীরা ঠাকুর। তার আজ্ঞা লেই আনে করিরে প্রচার॥ আন সেবা পাইঁ পাত্রে নকর কটাল। কলে আম্ভে এ জগতে হেবু হীন বল॥ প্রভু বরষ পর্য্যন্তে গম্ভীরা আগরী। উভামাবস্থা কালে দর্শন উভারী॥ রথীপুরু রাজা আসি ক্ষেত্র বাস কলে।

শব্দার্থঃ—পট্টজ্যোতি নায়বন্ধু—মন্দিরের সর্বশ্রেষ্ঠ ৩৬ নিয়োগ নায়ক, হকারী—ডেকে পাঠিয়ে, সমাপিত—সমাপ্ত, মোহন কর্ম্ম – জগমোহনের নির্মাণকাজ তখন পর্য্যন্ত সমাপ্ত হয়নি। দক্ষে—দক্ষিণে, লোড়া—প্রয়োজন, খণ্ডুআ পাছড়া—জগন্নাথ পরিহিত প্রসাদী গীতগোবিন্দ উৎকীর্ণ বস্ত্র।

উভামাবস্থা—আষাঢ় অমাবস্যা

প্রভুর চরণে সর্ব্ববিধি সমর্পিল। চৈতন্য ঠাকুর আন্ত সম্পদ ভইল॥ স্নান পূর্ণিমারে প্রভু কলে দরশন। সিংহদ্বার ছতা মঠে বৈষ্ণব সেবন ॥ ছতা বটতলে প্রভু বসন্তি বিধিরে। অষ্টকাল কীর্ত্তনরে পুলক শরীরে। স্নান জল পরিচ্ছা যে আপি সমর্পন্তি। সন্ধ্যাকালে গম্ভীরাকু সকলে গমন্তি ॥ রাত্রমধ্যে জগন্নাথ দরশন কু আসি। ন দেখি বিরহ ঘেনি বিষাদরে বসি ॥ শ্রী দেউলু সংকীর্ত্তন ঘেনি বিজে করি। অলালনাথ গমন্তি নিয়ম আচারী ॥ পন্দর দিন সে একাসনে পড়ি থান্তি। বৈষ্ণব মণ্ডলী বসি নাম আচরন্তি ॥

ন ঘেনন্তি তিলক যে ন ঘেনন্তি মালা। কৃষ্ণ বিরহ চিন্তনে মৌন যে নিরোলা॥ স্থল কর কটি পাদ দণ্ড প্রস্তররে। বার বর্ষে গর্ত্ত প্রায় হোইলা সে ঠারে॥ ভাব রসে সাহান যে তরলি ন গলা। কঠিন শিলা ভাবরে ক্ষীণতর হেলা। বিরহ রস চিহ্ন জগতে রখিলা॥ পঞ্চভূত শরীরর এ নুহে লক্ষণ। ন দেখিলা এহি লীলা জগত নয়ন॥ চতুর্দ্দশী নিশা কালে পুনী বাহুড়ন্তি। দেউল বেড়া করিণ গম্ভীরা পসন্তি॥ রাজপ্রাসাদ সমর্পি বিরহ খণ্ডই। পুন সংকীর্ত্তন নাদে ক্ষেত্র যে কম্পই॥ উভা অমাবস্যা কালে করণে মিলিলে। রাত্রহুঁ গমন্ত প্রভু বিচারিলে॥ সিখি মহান্তি কহ্নাই খুন্টিয়া নিকর। নিরঞ্জন মহাপাত্র পুষ্পালক কর॥ বটেশ্বর স্বাইঁ ঘেনি দইতা মণ্ডল। গম্ভীরারু নেলে প্রভু করি পটুআর॥

অনসরে থিলে তাতি ফিটন্তে দেখাই। ক্রন্দন করি সে গোরা (রায়) চৌদিক কম্পাই॥ কোল করি জগন্নাথে ধরি মূর্চ্ছা গলে। হস্ত জাব ফিটাইল দৈতা আনিলে॥ আট বর্ষ এহি মত করাই দর্শন॥

শব্দার্থ ঃ—পরিচ্ছা—মন্দির নীতি পরিচালক, রাত্র মধ্যে —মধ্যরাত্রে

সাহান—এক জাতীয় স্যাণ্ড স্টোন, বাহুড়ন্তি—ফিরে আসা

ফিটন্তে—উন্মোচন হ'লে, হস্ত জাব—হাতে খিল ধরে যাওয়া, ফিটাইল—খুলে দিল, দৈতা—শবর সেবক

দইতা যে পিয়জন ভাব অনুযায়ী। ডোরী পতনী রে প্রভু মণ্ডন করন্তি॥ কৃষ্ণ বিরহ পাগল প্রায় দেখা যান্তি। ঝাড়ু মঠ বৈষ্ণবে ঝাড়ু দেশ দেখি॥ হরিমন্দির মার্জ্জন ভাব উপলক্ষি। নিবাস করিল প্রভু গম্ভীরা মন্দিরে॥ বোলিল চলবে সর্ব্ব সে জনকপুরে॥ জগন্নাথ প্রকটিত যে স্থানে বিদিত। মহারাস স্থল তহিঁ হই (য়া) উপগত॥ মার্জনা করিব হস্তে আড়প মণ্ডপ। গুণ্ডিচা মার্জ্জনা লীলা বৈষ্ণব সহিত॥ নিত্যানন্দ হকারিয়া সঙ্গে করি নিল। গৌড়িয়া উড়িয়া সর্ব্বে কীর্ত্তন চলিল॥ দুই কুয়ে দেলে নিয়ে সৌধর ছিটিকা। বেড়া বাহিরিলে সর্ব্ব বৈষ্ণব রসিকা॥ আপনে চন্দন বারি কর্পূর বোলিয়া। মহাযোগী পখালিলে নেত্রাশ্রু হইয়া॥

মণ্ডপে বান্ধিলে নেত অশ্রু নেত্র গোরা। মার্জ্জনা করিল সর্ব্বে ভাবান্বিতে ত্বরা॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নাহান করিলে। নৃসিংহ বল্লভ তোটা মধ্যে প্রবেশিলে॥ চুড়াদহি পরসাদ কাহ্নাই খুন্টিয়া আনিলে। সকলে প্রসাদ পাইঁ অঙ্গ স্বস্তি কলে॥ নরসিংহ দরশন করি ক্ষেত্র বাহুড়িলে। সংকীর্ত্তন গান করে ভাবাবেশে গোরা॥ কালি প্রাণনাথ এথি আসিবেক পরা। বৈষ্ণব জনঙ্ক সঙ্গে প্রভু কইল পথ কেলি। যে যাহা ভুবনে (গলে) যে ঝা নাম মন্ত্র ধরি॥ পার্ষদ লইয়া প্রভু মন্দিরে পসিলে। বেড়া সংকীর্ত্তন নৃত্য লীলা আচরিলে॥ ভোগ বিষই আসিন প্রসাদ সমর্পিল। নবযৌবন দর্শন বড়ই সুন্দর। নিত্য নবকৈশোর প্রভু নটবর॥ পাত্রগণ রাজা অগ্রে কহিবা প্রকারে। পরিছা সমর্পি দেলা মেরদা বিধিরে॥ প্রভু মেরদা দেউলে সুখে বিজে কলে।

শব্দার্থঃ—আড়প মণ্ডপ—গুণ্ডিচা মন্দির, সৌধর ছিটিকা—চূনের ছিটে
নেত—রেশম বস্ত্রের পতাকা, বাহুড়িলে—ফিরে আসলেন, যে ঝা—যে যাহা, ভোগ বিষই—প্রসাদ সম্বন্ধীয় সর্ব্বোচ্চ অধিকারী।

সম্মুখে যে ভাগবত লীলা বিলোকিলে। ভোগ মণ্ডপ দেউলে দণ্ডবত কলে॥ বেড়াশয় মেরদারে বসি কিয়ৎক্ষণ। সংকীর্ত্তন গাইল যে তথি ভক্তগণ॥ প্রভু জগন্নাথ দর্শন সুন্দর। তা পাইঁ বৈষ্ণব পক্ষে এ ঘর স্বীকার॥ নব (৯) বর্ষ ঘোষ যাত্রা-পথরে দেখিন। বেড়া সংকীর্ত্তন সহ পহণ্ডি দর্শন॥ দ্বিতীয়া দিবস দুই ঘড়ি ঠারে। অপূর্ব্ব কীর্ত্তন ঘেনি সপার্ষদগণ॥ সুবর্ণ যে ব্রহ্মচারী জগন্নাথ পট্ট ডোরি নেই। গৌরাঙ্গ গলারে আনি দেলেক গুড়াই॥ দামোদর লীলা গাই নদীয়ারমণ। অচেতন প্রায় কৃষ্ণ হুঁকার করিণ॥ জগন্নাথ সঙ্গে নাচি নাচি পহণ্ডির তালে। প্রভু অত্যন্ত সুন্দর ডোর মাল গলে॥

সিংহদ্বারে নীলাচল নাথঙ্ক বদন। অচল ব্রহ্ম সচল শ্রীমুখ দর্শন॥ উদ্দণ্ড নর্ত্তন ভাব দেখন্তি সর্ব্বজন। কলা বেঠিয়াবু ধরি গৌর মনোহর॥ দুহুঁ গোপী, গোপিনাথ বিচার জ্ঞানর। প্রতাপরুদ্র নৃমণি মার্জ্জনী ধরিণ॥ ছতা তলু প্রহরিল পথ নৃপ রান। তার ভাব দেখি গোরা বোলে আণ্ট করি॥ ইয়ে নুহেঁ রাজন কৃষ্ণ পার্ষদ কিশোরী। ধন্য রাজা মার্জনীর করে সেবা করে॥ এ জগতে নাহি কাহিঁ অছি নীলাচলে॥ শকে চতুর্দ্দশাধিক দুই পঞ্চাশ অব্দে। রথো মহোৎসব হেলা বিষম প্রমাদে॥ চারি সম্প্রদায় ধরিণ গৌরাঙ্গ সুন্দর। নৃত্য নাম গীতে সুরে অন্তরীক্ষ পুর॥

শব্দার্থ ঃ—নব বর্ষ—অতীতের ন' বছর, পহণ্ডি—যে পদ্ধতিতে জগন্নাথ বিগ্রহকে রথে আনা হয়। গুড়াই—জড়িয়ে দিল।
আণ্টকরি—দৃঢ়ভাবে।

খোল করতাল ঘণ্ট ঘোষ সহ মিলি। অপূর্ব্ব শবদ ঘোষে রথ যায় চলি ॥ তাল ধ্বজে বলরাম কেতে পথ চলে। ভকতে আকুল করিণ দৌড়ি ধরিলে ॥ ভয়েনী সে নন্দ সুতা তা পছরে গলে। নন্দী ঘোষ চলিব'কু ভেরি শব্দ হেলে (লা) ॥ ভকত দৌড়ি ধরি আণ্টরে ভিড়িলে। বারম্বার ধ্বজা ধারী কলেক চিৎকার ॥ রথ ন চলই শুভে জয় জয় কার। বহুপচার হেলা রথ ন চলিলা ॥ উদাস হোইণ সর্ব্বে প্রমাদ গণিলা। রাজা রথ আগে পড়ি ঘেনি নিউছালি ॥ কহে কৃপা করি চল প্রভু বনমালি। তিনি দণ্ড গলা রথ ন চলিলা। ডাকি যেনা মণি রাজা আজ্ঞা আচরিলা ॥

চারি গজ শালু আনি রথরে লগাঅ। কুম্ভ দেই ঠেলন্ত সে তুরিতে জগাঅ ॥ তৎক্ষণ মাহুন্তে যে হস্তি চারি ঘর। আনি লগাই ঠেলিলে আষ্ঠে রথ বর ॥ ন চলিলা রথ হাহাকার পড়ি গলা। সংকীর্ত্তন মাঝে গোরা হুঁকার রচিলা ॥ পবন বেগরে আসি গজঙ্ক মধ্যরে। ঠেলিলে রথ-বর রথ চলই বেগরে ॥ জয়গোরা জগন্নাথ গৌরাঙ্গ সুন্দর। শবদে কম্পে জগতে জয় জয় স্বর ॥ রাজা আসি চরণরে পড়ি ততক্ষণ। ন কর পৃথক প্রভু রথন্ত শরণ ॥ নুহে মানব ইয়ে সাক্ষাত ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গজ পতি কোল করি। নোহে নৃপ জগন্নাথ দাস বলিহারি ॥ ভক্ত তুঁহি তোরে আজ পার্ষদে ঘেনিলু। নাম প্রেম প্রচার রে তোতে নিযোগিলু। এহি মত দশ বর্ষ রথ মহোৎসবে ॥ গৌরাঙ্গ রচিলে লীলা নামর প্রভাবে। আহুড়া বাহুড়া হেরা উৎসবে কীর্ত্তন ॥

শব্দার্থ ঃ—ভয়েনী—ভগ্নী, ধ্বজাধারী—যে পতাকাধারী রথচালনার নির্দ্দেশ দেয়। নিউছালি—সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, যেনা মণি—রাজপুত্র।

লগাঅ—লাগাও, কুম্ভ—হাতির মাথার অগ্রভাগ, চারিঘর—হস্তির সংখ্যা, আহুড়া—গুণ্ডিচা, বাহুড়া—ফিরে আসা।

জগন্নাথ রথযাত্রা সুখে শেষ হেলা। রায় রামানন্দ এক উৎসব করিলা॥ জগন্নাথ বল্লভর উদ্যান মধ্যরে। ভক্তি বৈষ্ণব নাটকে অভিনয় করে। দেখিলে বৈষ্ণবগণ অভিনয় কলে। গজপতি বড় যে না কাশী মিশ্র আসি॥ সম্মুখে বসি দেখিলে রায়ঙ্কু পরশংসি। প্রতাপ নরেশ প্রভু সমীপরে বসি॥ নব নব ভাব প্রকাশন দেখি খুশি। রায় দেবদাসী শিখি কহ্নাই খুন্টিয়া॥ মান প্রতিহারী অভিনয়ে পরশংসিয়া। মুহুর্মুহু জয় কৃষ্ণ জয় রাধা হরি॥ শবদে কম্পিল গুপ্ত বৃন্দাবন স্থলী। লীলা শেষে প্রভু কর ধরি নৃপমণি॥ পস্তি মণ্ডপরে বসি বিচার কারিণী। পচারন্তি নাম তত্ত্ব ভক্তির বৈভব॥ অন্তরঙ্গ ভাবে প্রভু দেলে মহাভাব॥

ধন ধান্যে রাজ্য সর্ব্ব ইহ লোকে সার। বদ্ধ জীব গণঙ্ক এ গান সম্ভার॥ মুখ্য জীব পাইঁ সর্ব্ব আনয়ী আসক্তি। মুখ্য কৃষ্ণে রতি নামে অখণ্ড পিরতি॥ যুব রাজে রাজ্য দেই নাম কর সার। বিষ্ণু অংশে জাত তোর শ্রেয় পন্থা ধর॥ নাম বিনু অন্য গতি কলিযুগে নাহিঁ। জ্ঞান যোগ ক্রিয়া সর্ব্ব বিঅর্থ হুঅই॥ নাম গতি ভক্তি পথ লক্ষ্য কৃষ্ণ জান। এহা বিনু অন্য সর্ব্ব অটে অকারণ॥ কহি প্রভু গলা মালা রাজা গলে দেলে। কৃষ্ণ মতি হেউ কহি আলিঙ্গন কলে॥ জগন্নাথ দরশনে হেলে ততপর। গম্ভীরা গমিয়া প্রভু বিশ্রাম করিলে॥ এহি মত লীলা নাম সংকীর্ত্তন গলা। দক্ষিণ পটকু দূত আসি জনাইলা॥ বোলইছি দেব বিদ্যানন্দর প্রতি। দণ্ড পাট ন মানন্তি স্বহৃদ নৃপতি॥ রাজা শুনি উদ্‌বেগরে রাই যেনামণি। গোল সম্ভাল হে বীর যেনামণি॥

শব্দার্থ ঃ—পরশংসি—প্রশংসা করিলেন, পস্তি মণ্ডপরে—যেখানে ভোগ নিবেদন হয়।

বিঅর্থ—ব্যর্থ, পটকু—দেশ থেকে, স্বহৃদ— জামাতা, দণ্ড পাট ন মানন্তি—রাজ্যের সীমা মানছে না, রাই—ডাকি, যেনামণি—জ্যেষ্ঠ পুত্র।

শক চৌদশ অষ্টাধিক ত্রিংশ বর্ষ। যেনামণি বিজে কলে সে দক্ষিণ দেশ ।। আন্ত পাইকঙ্কু নেই বীর ভদ্রবীর। বিদ্যানগর বন্ধুরে হোই ক্রোধবর ।। রাজা সার্বভৌম মুকু ভাগবত শুনি। কৃষ্ণনাম রসে তোষ বীর চূড়ামণি ।। বালি নবররে কৃষ্ণ মূর্ত্তি বসাইলে। কনক দুর্গাঙ্ক পূজা কাশী মিশ্রে কলে। অটর দিনরে দূত দক্ষিণক অইলা ।। জীবন হারিলা যেনামণি বখানিলা। শুনি রাজা অচেতন হেলে মহাদেই ।। রাতিরে কটক পথে নৃপ গলে তহিঁ ।। চৈতন্য ঠাকুর আগে প্রতিহারী যাই। কহিলা নৃপর দশা মুণ্ডে কর দেই ।। শুনি সকল ভকতে সন্তাপ করিলে। শ্রীচৈতন্য গৌড় যাত্রা করিবু ভাষিলে ।। সাতদিন অন্তররে ঘেনি পরিজন। কটক পথরে প্রভু করিলে গমন ।।

রামানন্দ শিখর যে কহ্নাই আবর। কণ্টক পথরে গলে কীর্ত্তন সংগর ।। কটকে রহিলে তঁহি তিনি দিন প্রভু। নৃপরে মিলি সান্ত্বনা দেলে মহামতি বিভু ।। রাজা ন যাঅ বোলিন অনুরোধ কলে। প্রভু আসিবি তুরিত অঙ্গীকার দেলে ।। বোইলে সে জগন্নাথ নন্দাত্মজ মোর। (প্রাণপতি) তার বিনু অন্যগতি নাহিঁ গৌরাঙ্গ সুন্দর ।। যাহা বা ঘটই বা ঘটিব সকল। জগন্নাথ ইচ্ছা তঁহি নাহিঁ আন বল ।। বিদ্বেষরে জন ক্ষয় অটে পরিণতি। কৃষ্ণ সেবা নিরন্তর সাধু জন গতি ।। গড়-গড়েশ্বর প্রভু দর্শন করিলে। বৈষ্ণব গণঙ্কু ক্ষেত্র জাঅ আজ্ঞা দেলে ।। বৈষ্ণব সকলে কান্দি বালিরে লুটিলে। অচিরে ফেরিবু কহি মৌন হোইলে ।। স্বরূপাদি গলে প্রভু পথ অনুসরি।

শব্দার্থ :—জীবন হারিলা– প্রাণ হারালো, অইলা—ফিরে এল, মহাদেই—মহারানী, ভাষিলে—বললেন।

গড়-গড়েশ্বর – কটকের প্রসিদ্ধ মহাদেব।

ক্ষীর চোরা রামানন্দ করিলে দরশন। নেউটিলে ক্ষেত্রবরে ঘেনি নিজজন॥ ক্ষেত্রে বিপ্র জগন্নাথ আদি ভাগবতি। নানা প্রচার করন্তি মিলি নানা মতি॥ সর্ব্বে মিলি সংকীর্ত্তন নিত্য মিলি আচরিলে। হরিদাস পাশে সর্ব্বে মিলি নাম কলে। হরে কৃষ্ণ রাম মন্ত্র করিলে প্রচার॥ হরে রাম কৃষ্ণ মন্ত্রে স্বধর্ম বিচার। গ্রামে গ্রামে শ্রীচৈতন্য নামর প্রচার॥ করিলে উৎসব হরি গোষ্ঠী মনোহর। হরি জন্ম উৎসবরে লীলার গায়ন॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গুণ নামর কীর্ত্তন। যে যে স্থানে মহাপ্রভু যে লীলা রচিলে॥ উৎকলী বৈষ্ণবগণ স্বরূপে রচিলে। জগন্নাথ ভাগবত পুরাণ পড়ন্তি॥ চৈতন্য গোসাইঁ পদ নিত্য বখানন্তি। গদাধর গোস্বামী যে তোটা গোপীনাথে॥ সেবা করি মিলন্তিক ক্বচিৎ তাঙ্ক সাথে। রায় রামানন্দ গীতাবলি পদ গান করি॥ জগন্নাথ বল্লভরে মণ্ডলী আচরি।

রাত্র দিবা সত সংঘ নাম রসসারে। ক্ষেত্রে প্রচারিল সর্ব্ব বৈষ্ণব নিকরে॥ আঠমাস গলা এহি মত প্রচার রে। গৌরাঙ্গ ফেরিলে পুন পূর্ণ নীলাচলে॥ স্বরূপাদি ভক্তগণ আসিন মিলিলে। রথ মহোৎসব লীলা আপনে রচিলে॥ ইতিমধ্যে রাজা সর্ব্ব ধর্ম্ম আচরণে। করিলে নামে পিরতি পরম কারণে॥ সন্তাপিত মনে (রাজা) যেনামণি অর্থে। তথাপি ভেটিল কন্যা তুষাপতি পাশে॥ প্রভু বহুমতি তাঙ্কু দেলে উপদেশ। ভুলি কহুঁ দুঃখ রাজা সে সাধুঙ্ক মানস॥ বড় যে না গোপীনাথ কান্থির বিষয়ী। হরিল যে বহু বিত্ত হোইন বিষয়ী॥ রাজা তারে দণ্ডিবার কারণে রাইল। কটকে অটকে তাঙ্কু আকটে রাখিল॥

শব্দার্থঃ—বখানন্তি—ব্যাখ্যা করলেন।

কান্থি—কাঁথি, অটকে—আটকে, আকটে—দৃঢ়ভাবে।

রায় রামানন্দ দুঃখ সাগরে বুড়িল। প্রভুর সমীপে কিছিমাত্র ন ভাষিলে॥ সেবক শঙ্কর দিনে গম্ভীরারে বসি। প্রভুঙ্ক সমীপে কহে শোক বহি আসি॥ রামানন্দ দুঃখ প্রভু সহি ন করন্তি। পটাও করণে কহ নৃপ ক্ষমা আবরন্তি॥ দেউল করণ প্রভু আজ্ঞা ঘেনি গলা। কটকরে রাজা আগে ক্রুতান্ত কহিলা॥ রাজা কহে গণ অর্থ করে যেহু চোরি। তাহার মস্তক ছেদ নীতিরে বিচারী॥ সমস্ত বিত্ত সে দেব ইহা দৃঢ় জান। প্রভুর ভাবরে তার হেব পরিত্রাণ॥ ভূমি বৃত্তি তাহাঙ্কর কোট হই গলা। বিষয়ী পদ কড়িন ক্ষমা তাঙ্কু দিলা॥ ক্ষেত্রবরে আসি প্রভু পাথরে পড়িলা। রাজা ন চাহিলা মুখ রায় ন চাহিলা॥ রাজা নিজে ক্ষেত্রবরে অপযশ হেলা। প্রভু পাশে ন রখিলে নিত্য লীলা মগ্ন। আপনি রচিলে ধর্ম প্রচার কীর্ত্তন॥

"মহন্ত সভা" এক দিন বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়া দিনরে। দেউলে প্রবেশ প্রভু কীর্ত্তন সহরে॥ বেড়াবারে পরিক্রমা করি বাড়া সমীপরে। দেখিলে মহন্ত সভা বসিছি···বিধিরে॥ দণ্ডি ব্রহ্মচারী যোগী আচারী বাউলী। রামানন্দী নিমানন্দী সর্ব্বাচার্য্য মিলি॥ পুছিল আখড়া পতি ঘেনি পুষ্প মালি। বৈষ্ণব উচিত বাক্য প্রণাম আচরি॥ জগন্নাথ তত্ত্ব আম্ভে না পারুছ কলি। কহন্ত সন্ন্যাসী মণি তাহার তদন্ত। যেমন্ত আপনে জান এ তত্ত্ব মহত্ত্ব॥ বৈষ্ণবে এয় তত্ত্বকু কর অঙ্গিকার। হসি বিনম্র গোসাই কহিলে সত্বর। চিন্তামণি তত্ত্ব কেহ কহ সাধুবর॥

শব্দার্থ ঃ—ক্রুতান্ত—বৃত্তান্ত, কোট—বাজেয়াপ্ত, কড়িল—কেড়ে নিল।

মহত্ত্ব—মাহাত্ম্য, বাড়া—প্রতিহারী নিয়োগের আস্থান।

সর্ব্বদেবময় কৃষ্ণ বোলি উচ্চারিল। বৈষ্ণব ভেদরে তিনি দৈবত হইল॥ শ্রীনারায়ণ মহামন্ত্রে শ্রীবৈষ্ণবগণ। সন্ন্যাসী গণকর সে পরম টি পুন॥ রামনাম প্রভাবকু রামানন্দী পথ। কৃষ্ণনাম সকলঙ্ক অটই পবিত্র॥ কৃষ্ণ নারায়ণ রাম এ তিনি প্রসিদ্ধ। এহি তিনিরু বলি নামে অছি কি হে সাধ্য॥ দেখন্ত বৈষ্ণব জনে আবর সন্ন্যাসী। জগমোহনরে যাই নীলাদ্রি নিবাসী॥ কর বিলোকন গোরা সে ঠাবে কহিন। বসি মহামন্ত্র নাম করিলে কীর্ত্তন॥ সর্ব্বে জাই জগমোহনে দেখন্তি। সিংহাসনে বিজে এক অপূর্ব্ব মুরতি॥ ত্রিভঙ্গ ছন্দরে উভা নন্দর নন্দন। পীতাম্বর হৃদ তটে গোপী শ্রীচন্দন॥ মুকুট মণ্ডিত শিরে শিখি পুচ্ছ শোভা। হৃদয়ে মুরালী রাজে ত্রিভুবন লোভা॥ চারিহস্ত সুনির্মল নারায়ণ হরি। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভিত মুরারী॥

ধনু বান সহ দুই ভুজবি শোভিত। কৃষ্ণ নারায়ণ রাম ত্রিমূর্ত্তি উদিত॥ সর্ব্ব সম্প্রদায় ইষ্ট সকলে দেখিলে। কৃষ্ণ চিন্তামণি তত্ত্ব প্রত্যক্ষে লভিলে॥ রাজপুর করণ যে আচার্য্য প্রধান। পুষ্পালকে আদি দেখি চকিত নয়ন॥ সর্ব্বে বেড়া মধ্যে গৌরাঙ্গ সমীপে। প্রণমিল জয় শব্দে রীতি অনুরূপে॥ বোইলে সর্ব্ব বৈষ্ণব বিচারর সার। কৃষ্ণ চিন্তামণি নাম সার্থক শব্দের॥ তব করুণারু এহা জগতে রটিলা। হরে কৃষ্ণ রাম মন্ত্র সার প্রসারিলা॥ যেউঁ স্থানে মাহান্ত যে প্রভু গোরা রায়। বিরাজিত থিলে রাজা প্রভাবরে থয়॥ কীর্ত্তন মণ্ডলী নাম তাহার হোইলা। সংকীর্ত্তন সর্ব্ব তঁহি হেবা নির্দ্ধারিলা॥

শব্দার্থঃ—হেবা—হইবে, ছন্দরে—ছাঁদে, আবর—সকল।

আচারী বিচারী দণ্ডী রামানুজী গণ। কীর্ত্তন মণ্ডলী স্থানে হেলে একমন॥ জগন্নাথ কৃষ্ণ চিন্তামণি নন্দসুত। সাক্ষাত ত্রিরূপ যেণি ভাবরে উদিত॥ জয় গৌর জয় গৌর সকলে ভাষিলে। সংকীর্ত্তনে সদা নেই গম্ভীরা গমিলে॥ প্রভু বর্ষ পর্য্যন্তরে গম্ভীরা মধ্যরে। নিবাসিলে সংকীর্ত্তন প্রেম রস ভরে॥ মহাপ্রসাদ সেবন ভাগবত পাঠ। সকল বৈষ্ণব সাধু সেঠাবে পইঠ॥ শাসনী আসনী অবধূত শূন্য নামী। সকলে মিলন্তি তথি হোই নাম প্রেমী॥ এক দিনে ভিতর পরিছা সিংহারী। কহন্তি গম্ভীরা ঠাবে কৃষ্ণলীলা স্মরি॥ দুগ্ধ মেলান তত্ত্বকু উষতে ভাষিলে। প্রভুর মন উচাট করি বাহুড়িলে॥ দিনে নিশাকালে সে যে শঙ্কর গোবিন্দ। দেখিলে গম্ভীরা পাশে নাহিঁ পূর্ণ চান্দ॥

আকুলে হকালী সর্ব্বে বৈষ্ণব উঠিলে। গৌর ন'দেখিন বনে খোজিন বুলিলে॥ দুগ্ধ মেলান রাত্র রে মহা ভোই ঘর। বাহারন্তে গোগোষ্ঠরে মিলি মহামের॥ গো গোষ্ঠ পছরে কৃষ্ণ প্রায় নৃত্য করি। রাম কৃষ্ণ বিজে পথে প্রভু অনুসরি॥ জগন্নাথ বল্লভর দণ্ডারে মিলিলে। অপূর্ব্ব মেলান লীলা প্রীতিরে হেরিলে॥ গো গোষ্ঠরে বচ্ছতরি প্রায় প্রভু সোই। চাটন্তি গো-কুলে অঙ্গ কৃষ্ণ ভাব বহি॥ লোচা কোচা কর পাদ ভূমিরে গড়ন্তি। অপূর্ব্ব প্রকারে বাল্যলীলা সুমরন্তি॥ বৈষ্ণবে মিলিন প্রভু বহি করি নেলে। গম্ভীরারে আকটরে জগিবা বোইলে॥ দোল পূর্ণিমাকু হোইলে বাহার। সংকীর্ত্তন কলে প্রভু হিন্দোল ছামুর॥ চন্দন স্যন্দনোচ্ছব বিধিরে রচিলে। গৌড় ভক্তগণ সবা বিদায় লইলে॥ জগন্নাথ দর্শনকু পুনঃ বিজে কলে॥

শব্দার্থঃ—উষতে—আনন্দে, উচাট—উচাটন।

বচ্ছতরি—বাছুর, স্যন্দনোচ্ছব—স্যন্দনোৎসব (স্যন্দন-রথ)।

শ্রীহরি জন্মাষ্টমী দিন প্রভু চৈতন্য সুন্দর। হরে কৃষ্ণ নাম করি দর্শনে বিভোর ॥ খসই চরণ পড়িবার উপক্রমে। বামহস্ত তিনি অঙ্গুলিরে ভাব থামে ॥ মুখে নাম ভাবাবেশে চারি ঘড়ি। নিশ্চলে রহিলে ভক্ত জনে তথি মিলি ॥ গোপীনাথ পট্টনায়ক যে চেতা করি। গোপী আচার্য্য কহ্নাই খুন্টিয়া আবরি ॥ পরিছা মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র আসিন ॥ অঙ্গুলী চিহ্নরে দেখি গর্ত্তর প্রমাণ ॥ পাদ চিহ্ন মধ্য তল প্রস্তরে পড়িছি। যেনামণি প্রহরাজ মহাপাত্র দেখি ॥ এ যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাবাবেশ কল। তরলিছি পাষাণ যে চিহ্নি রক্ষা কর ॥ শক বর্ষ চৌদশ ছয়ালিশ সালে। অজ্ঞানু প্রমাণরে জাগ্রতরে রসিলে ॥ সেহি দিন নন্দোৎসবে প্রভু নন্দোৎসব দেখি। লীলা মাধুরী দর্শনে হেলে মহাসুখি ॥

মহাপাত্র পরমানন্দ ভিতরছ কন্দ। সুবর্ণ রে বিভূষিত মুকুট বিষদ ॥ শুক্ল পরিধান নৃপ প্রায় সু-উদর। লাবণ্য যশোদা মাতা রূপে লীলা করি ॥ রোহিণী রূপরে অন্যা দাসী যে গৌরী। তিলক হরিমন্দির তুলসীর মালা। কটিরে সুবর্ণ ঘন্টি অতি মনভুলা ॥ দেখিন পিতর বোলি গোরা প্রেম ভোলে। সংকীর্ত্তন নেই প্রভু নগরে বুলিলে ॥ বালিনবরু গম্ভীরা মন্দিরে মিলিলে। তহুঁ জগন্নাথ বিপ্র আস্থানে গমিলে ॥ বড় দেউলে বসিন রাম কৃষ্ণ কোলে। ক্ষীর তুহিঁ পিয়াইলে যে স্ব-কররে ॥ প্রভু তহিঁ বাল পরি করন্তি ক্রন্দন। ক্ষীর দিঅ আন্তে অটু নন্দর নন্দন ॥ প্রসাদ ক্ষীর তুলারে ভিতরছ দেলে। পিতা সম বোলি গোরা গাড়ে কোল কলে ॥ শ্রীচৈতন্য পুত্র পরি সেবিলে প্রেমরে। বরিণ গৌর মুরতি গৃহে পূজা কলে ॥

একদিন প্রত্যূষরে কার্ত্তিক দ্বাদশী। অবকাশ বড়াইলে সেবক চৌরাশী॥ কহ্নাই খুন্টিয়া, শিখি, দামোদর দেশ। পাদোদক ঘেণি সর্ব্বে গম্ভীরা প্রবেশ॥ গম্ভীরা ভাবরে সর্ব্ব বৈষ্ণবঙ্ক মেলে। ভাগবত পড়ন্তি যে বক্রেশ্বর ধীরে॥ প্রভু পাশে পাদোদক ঘেনি উপগত। কাঠি লাগি পরসাদ পাই গদগদ॥ প্রভু মুখে নেলে 'হরি হরি' উচ্চারিলে। সকলে সেবা কলেক বোলিলে॥ মুণ্ডে বোলি কৃষ্ণনাম কলে উচ্চারণ। কাঠি প্রসাদ ধরিণ প্রভু কহে পুনঃ॥ ভকত শিখর হরিদাসে দিঅ নেই। তোটা অক্কি তেহুঁ সর্ব্বে মিলিলেক তহিঁ॥ হরিদাস মণ্ডপরে প্রবেশি সত্বর। কাঠি অগ্র জল সেবাকু যে তৎপর॥ মুখ বিস্তারী কহন্তি, ন ছুঅঁ মুঁ মূঢ় (মূর্খ)। মুখে পাদোদক দিঅ ভাগ্য মোর বড়॥ কাঠি প্রসাদরে জল শিখি সমর্পিলে। মহামন্ত্র পড়ি হরিদাসে আস্বাদিলে॥

জগন্নাথ কহি কাঠি পরসাদ নেই। ছেলা কাঠি পোতিলেক ভক্তি ভাব বহি॥ ক্ষেত্র পরিক্রমা দিন বৈষ্ণবে হেরিল। সাতদিনে দন্তি কাষ্ঠ পল্লবী উঠিল॥ জগন্নাথ কাঠি প্রভু পল্লবিত দেখি। সাক্ষাত ব্রহ্মের ভক্ত ব্রহ্ম হুয়ে সাক্ষী॥ উদ্দণ্ড কীর্ত্তন কলে পরিক্রমা করি। জগন্নাথের ভোগ্য ব্রহ্ম পূজিলে আবরি॥ হরিদাস মহাত্মা নিত্য জল দিয়ন্তি। বকুল খোলপা বড় হে মহাবৃক্ষ ভাতি॥ প্রভুর কর স্পর্শরে অপূর্ব্ব ঘটিলা। জগন্নাথ দন্তকাষ্ঠ সিদ্ধ তরু হেলা॥ জগত পাবন প্রভু চৈতন্য ঠাকুর। নাম প্রেম দানে সর্ব্বে করিলে নিস্তার॥ মার্গ শির শুক্ল পঞ্চমী সার তিথি। জীন বাস পিন্ধিল নীলাচল হাতি॥

শব্দার্থ ঃ—গভা—শিরের পুষ্প অলংকার, চৌসরা—চারিটি মালার একটি গ্রন্থি।

নাহি গডা কৌস্তুভ পদক চৌসরা। নাহি ফুল গুণা রাধা নামাঙ্কিত চীর ॥ দেখি গৌড়িয়া বেশ প্রভু বিমোহিত। এ রূপ রহস্য কিবা কহ হে তদস্ত ॥ পরমানন্দ পরিছা ভাব বুঝাইলা। কালি ঠাকু শীত লাগি হেবার হইলা ॥ আজি জিন বস্ত্র পিন্ধি জগত ঠাকুর। শীত সঙ্গে জুঝুছন্তি রসিক শেখর ॥ ঋতুরাজ শীত সঙ্গে কেলি আচরন্তি। কালি শীত দেখাইব আপনা শকতি ॥ শীত সঙ্গে ক্রীড়া কথা শুনি গৌরহরি। প্রাণনাথ কহি মূছি হেলে দাসে ধরি ॥ কিছিক্ষণে উঠি প্রভু হরিবোল দেই। গৌড়িয়া, ওড়িয়া সংকীর্ত্তন কলে তহিঁ ॥ ভাবাবেশে বিশ্বম্ভর বোইলে সেবকে। গোপীভাব আশ্রয়র বিগ্রহ এ ভবে ॥ মাধবী দাসী রচনা গীত গান কলে। প্রভু শ্রীমুখে ওড়িয়া পদ প্রকাশিলে ॥ তিনি পদ গীত ভাবে প্রভু গান কলে। উত্তরীয় ফিঙ্গি প্রভু রোমাঞ্চিত হেলে ॥ দেখহে সেবকে গণে শীতকু জিতিলু। মোর প্রভু ভাব আপে অঙ্গে প্রকাশিলু ॥ এহাকহি গোরা ভাবে ওড়িয়া ভাষিলে। সর্ব্বে জয় গোরা কহি ঘোষা পদকু রটিলে ॥

জগমোহনে পরি মুণ্ডে জাই। মন মাতিলারে কলা চন্দ্রমা চাহিঁ ॥ হেরিলু বিধুবদন গোপী হৃদয় চন্দন। তার অঙ্গে জড়ি যিবি কাল কালকু মুঁহি ॥ মন মাতিলারে কলা চন্দ্রমা চাহিঁ ॥ সুনহে রসিকবর হে নট নাগর বর নব কৈশোর কর। মধুর ছন্দা পয়র নাম তোর সদা মুখে রখ গোসাই। মন মাতিলারে কলা চন্দ্রমা চাহিঁ ॥ মুঁত প্রেমর চকোর, তুমে প্রেমী সুধাকর। প্রেমাস্পদ মো প্রেমর মহাভাব মো ভাবর ॥ যুগে যুগে থীবা নাথ একক হোই। মন মাতিলারে কলা চন্দ্রমা চাহিঁ ॥

পদ গাই গৌরচন্দ্র প্রণিপাত কলে। গরুড় স্তম্ভ কুণ্ডাই ভাবাবেশে হেলে॥ বহুক্ষণে জগন্নাথ এক লয় দেখি। গম্ভীরা পথে চলিলে হোই মহাসুখি॥ পুছিলে বৈষ্ণবগণ বসি গম্ভীরারে। খণ্ডুআ বসন গীতগোবিন্দ লেখারে॥ কেশনে জগন্নাথঙ্ক তাহা পরিধান। পিন্ধন্তি সেবকে অঙ্গে সে বস্ত্র কেশন॥ মহা অপরাধ সিনা অর্জ্জন করন্তি। পুণ্ডরিক কহে 'মোর নাশ মনোভ্রান্তি'॥ রামানন্দ কহন্তি যে জগত ঈশ্বর। রাধা ভারময় কৃষ্ণ রূপর শরীর॥ রাধা নামাঙ্কিত বস্ত্রে কৃষ্ণঙ্ক শরধা (শ্রদ্ধা)। প্রেম বাস মহারাসে রম্য নাহি বাধা॥ সকলে সেবকে গোপী ভাব পরায়ণ। পিন্ধন্তি প্রভু বসন প্রেমর সাধন॥ অপরাধ নোহে তাহা প্রীতির লক্ষণ দোল চাচরিয়ে প্রভু ভক্তগণ নেই। পটুআরে চলন্তি সে প্রীতিগীত গাই॥ একুআরে বোলাবোলি সুগন্ধ অবির। জন্মোৎসব গম্ভীরারে হুয়ে নিরন্তর॥

অনষঠী বৈষ্ণবঙ্ক মিলন হুঅই। গম্ভীরা লীলার ভাব জগতে ক্ষরই॥ দোল গম্ভীরারু আসন্তি পথ রে। মিলিলে বল্লভ আসি ভক্তিভরে॥ দেউলে বসিল দুহুঁ মোহনরে জাই। কৃষ্ণ তত্ত্ব শ্রবণরে সর্ব্বে সুখি হোই॥ এক কৃষ্ণ সে উপাস্য বল্লভ ভাষিলে। এক গীতা শুদ্ধভক্তি শাস্ত্র বোলি প্রমাণিলে॥ প্রভু ভাবাবেশে কহে ভাগবত সার। ভক্তি জোগর ব্যাখ্যান জান সাধু নর॥ বল্লভ তর্কর ছলে প্রমাণ সুনন্তি। ভাগবত লীলা শ্রেষ্ঠ বখানন্তি॥

শব্দার্থঃ—সিনা – নিশ্চিতরূপে।
জোগর—যোগের, অনষঠী—উনষাঠ।

সর্ব্বে ভাগবত লীলা করিলে স্বীকার। প্রভু গম্ভীরাকু চলে হেবই নির্ব্বিকার॥ চৈতমাস শুক্ল সপ্তমীর প্রাতকালে। মহোদধি স্নান ইচ্ছা বলিল সে কালে॥ ছড়ামাল পড়ি অছি গলারে মৌলী। উঠি সংকীর্ত্তন সহ প্রভু গলে চলি॥ বালিবন্ত গড়ি প্রভু চলন্তি স ধীরে। কৃষ্ণ দরশনে যেহ্নে যমুনা উছলে॥ অচিয়া ভুইরে সর্ব্ব বৈষ্ণবে চলন্তি। স্থির হেলে প্রভু তথি আচম্বিত মতি॥ বাম দিকে দৃষ্টি ভাবে নেত্র থন থন। এহি দেখ ভক্তজন গিরি গোবর্ধন॥ গোবর্ধন গিরিশ্রেষ্ঠ পশ্যন্ত বৈষ্ণবজন। কৃষ্ণ করাঙ্গুলি পরে যে করে মণ্ডন॥ ধন্য সে ভূধরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ লীলা সাক্ষী। গো গোপাল গোপ পুরে থীলা এহি রসি॥ সকলে আশ্চর্য্য হেলে ভাব হাব দেখি। চিরা মারি ধাইঁলে গৌর-সুন্দর। অচিআ পাথরে ভেটিল মন্দর ॥ প্রভু প্রেমে গোবর্ধন সেহু হেলা। ধাইঁলে বৈষ্ণবে তহিঁ ধাইঁ ন পারন্তি। গৌর গোবর্ধন বোলি চটক চড়ন্তি॥

খঞ্জ কৃশ স্থূল সর্ব্বে জলদ্‌ঘর্ম হোই। ধাইঁলে গন্তর তলে সংকীর্তন নেই॥ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ। নন্দগোপ কুমারায় গোবর্ধন ধরায় চ॥ নাম উচ্চারণে প্রভু ত্রিবার বুলিন। গুড়ুকঙ্ক শয্যা পরে সাষ্টাঙ্গ করিণ॥ গুড়ুকঙ্ক কণ্টারে যে বদন বিকল। ছেদ হোই ফুলি গলা লোম মূল॥ পাহাড় উপরে গড়াগড়ি সর্ব্বে হেলে। গোবর্ধন পরিক্রমা কীর্ত্তন রচিলে॥ রায় রামানন্দ গায় শ্রীগীতগোবিন্দ॥

শব্দার্থ:—চৈতমাস—চৈত্রমাস, মহোদধি—সমুদ্র, থন থন—থর থর।

অচিয়া—চটক পাহাড় এবং শঙ্করাচার্য্য মঠের বিস্তৃত অঞ্চলের নাম 'অচিয়া'। বর্ত্তমানে এই নামই প্রচলিত। গুড়ুকঙ্ক—বালির স্তূপ বা পাহাড়স্থিত একপ্রকার কণ্টকিত পুষ্প।

অশেষ বিদ্যার জ্ঞানী অচ্যুত গোসাঈ। ধ্যান লক্ষ্য ত্রাটকাদি নিত্য আচরঈ॥ নাম সংকীর্ত্তনে রতি সে ব্রহ্ম গোপাল। দীনবন্ধু খুন্টিয়াঙ্ক তপস্যার ফল॥ কহিলে পিতাঙ্কু রাই ধ্যানর সম্বল। চৈতন্য গোসাইঁ সেহু নাম অবতার॥ নাম বড় নামী লঘু তাহার বিকার। পুরুষোত্তমরে সেহু লীলা আচরন্তি॥ নাম ভক্তি দেই নিত্য জগত তারন্তি। জগন্নাথঙ্ক তত্ত্বকু জানন্তি গোসাইঁ॥ যুগল তত্ত্বর ভেদ তাঙ্কু জনা দুইঁ॥ চাল পিতা তাঙ্ক পাদ দর্শন করিবা। মন জানি কহিবেক মন্ত্র দীক্ষা নেবা॥ জগত জনঙ্ক গুরু চৈতন্য ঠাকুর। কলি সন্তরণোপায় জানন্তি নিকর॥ শক চৌদশ ষড়ত্রিংশ সম্বৎসরে। বৈশাখ শুক্লপক্ষ অষ্টমী দিনরে॥ নীলাদ্রি মহোদয়রে ভেটিবা প্রভুরে॥ নীলাদ্রি ঠাকুর সে যে পরাণ আন্তর। চৈতন্য ঠাকুর তাঙ্ক ভাব-অবতার॥

তিল কণারু সাধক পিতা সহিতরে। দশ শিষ্য ঘেণি গলে চলাকি পথরে॥ চৈতন্য দর্শন আশারে দুহুঁ ক্ষেত্রবরে। শুক্ল সপ্তমী তিথিরে গন্ধর্ব বটরে। অচ্যুত মিলিলে শিষ্য গণ সহিতরে॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন স্নান সারি সে ব্রহ্ম-গোপাল। গন্ধর্ব বট মূলরে বিশ্রামিলে ঠুল॥ রামদাস ভকত যে পাট-শিষ্য তাঙ্ক। ব্রহ্ম তত্ত্ব জিজ্ঞাসারে সেহু জ্ঞান রঙ্ক॥ দীনবন্ধু পিতৃদেব চরণ বন্দিলে। অষ্টমী বেল দেখিন বটতে উঠিলে॥ জলযাত্রা দেখি প্রভু হোই মহাসুখি। জগন্নাথ দরশনে তটস্থ নিরেখি॥ সর্ব্বরূপ দারুব্রহ্ম জগন্নাথ পদে। জল লাগি প্রসাদকু শিররে বোলিলে॥ সর্ব্বতীর্থ স্নান হেলা বোলি সে ভাবিলে। দ্বিপ্রহর কালে, প্রভু হোইলে বাহার॥ রামকৃষ্ণ সহ স্বয়ং মদন সুন্দর॥ বিমান আগিরে প্রভু চৈতন্য ঠাকুর। করন্তি কীর্ত্তনীগণ ভাব রস ভর॥ দুরু দেখি লোত করে নেত্র পূর্ণ কলে। বৃদ্ধ পিতাঙ্কু চৈতন্য চন্দ্র দেখাইলে॥ সংকীর্ত্তন সহ নাম করন্তি গায়ন। ভাবরে লোতক পূর্ণ অচ্যুত নয়ন॥

নরেন্দ্র তট পর্য্যন্ত পটুআরে গলে। বাহুড়া পথ রে চৈতন্যঙ্কু প্রণমিলে।। ভাবরস মুখ দেখি নদীয়া চন্দ্রমা। বোইলে উঠ সাধক পড়িঅছ কিয়াঁ।। বোইলে অচ্যুত প্রভু সর্ব্বজ্ঞ গোসাইঁ। কি বাঞ্ছা মোহর জান কল্পতরুতুহিঁ।। হরিভাবে মহাভাব হৃদে অছি জানি। কহিলে দীক্ষা দেবারে আন্তঙ্কু নমনি।। সনাতন গোসাইঁঙ্ক চরণ তু ধর। সেহি দীক্ষা দেবে তোত আদেশ মোহর।। ইঙ্গিতরে সনাতনে প্রভু আজ্ঞা হেলা। বৈশাখ শুক্ল একাদশী দিন শুভ হেলা।। সোমবার দিবা তিনি ঘটি যোগহেলা। কল্প বট মূলরে মন্ত্র দান কলা।। কর্ণরে প্রবেশি ধন্য হেলু সে কহিলে। 'হরে কৃষ্ণ' নাম বীজ মন্ত্র সেহু দেলে।।

রাধা ভাব মূল করি বুলাই কহিলে। আন্তে প্রভুঙ্ক আজ্ঞারে তোত দীক্ষা দেলু। সর্ব্ব জীব দীক্ষা দাতা চৈতন্য কহিলু। বোইলে সুধীরে প্রভু চৈতন্য গোসাইঁ। সর্ব্ব বিদ্যা সাধনরে মোক্ষ ফল নাহিঁ।। মহামন্ত্র কীর্ত্তনরে আনন্দ অপার। মহামন্ত্র গ্রামে গ্রামে করতু প্রচার।। গন্ধর্ব্ব মঠ নিকটে গোছন্দ যে বট। তথি নাম সংকীর্ত্তনে হেলে বড় চাট।। যোগ শূন্য সাধুনর আচরণে রহি। মাত্র নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করই।। চউষঠী গ্রামে নাম মণ্ডলী রচিলে। আগত ভবিষ্য কহি নাম প্রচারিলে।। প্রভু চতুর্মাস কাটি গম্ভীরা-লীলারে। ভাদ্ররে কৃষ্ণের লীলা আনন্দে আচরে।। তোটা গোপীনাথে হেলা বৈষ্ণবে পূজন। গদাধর পণ্ডিতঙ্ক প্রভু প্রাণ-ধন।। বয়ঃ বৃদ্ধ গদাধর আউ ন পারন্তি। প্রভুর সমীপে শোক করি আবেদন্তি।।

শব্দার্থঃ—কিয়াঁ—কেন।

চউষঠী—চৌষষ্ঠী। বুদ্ধ—বৃদ্ধ।

সেহ প্রভু অন্য বৈষ্ণবকু সেবা সার। আম্ভে অক্ষমরে অপরাধর শরীর॥ প্রভু কহে গোপীনাথ আম্ভে তুই জান। তোর সেবা বিনু আম্ভ সুখ নাহি মন॥ কালি তুম্ভ ভাব অনুসারে ফল দেবু। তুম্ভর সেবা সুখকু আম্ভে ন তেজিবু॥ চিতা লাগি সংকীর্ত্তনে প্রভু গ:ল। গম্ভীরারে গদাধর পণ্ডিত সেবিলে। শঙ্কর যে গদাধর কর ধরি নেই। তোটা গোপীনাথে ছাড়ি তুরিতে আসই॥ প্রভু স্বরূপ রায়ঙ্ক পাশে সোইন॥ কহন্তি গোপীনাথ যে গদাধর প্রাণ॥ সেবাকু অক্ষম বোলি কহন্তি গোসাইঁ। কালি পুরাইবু আস আম্ভে তাহাঙ্কর। প্রত্যষরু উঠি স্বামী বুদ্ধ গদাধর॥ সেবাকু জোগাড় করি কর ঘণ্টা ঘেনি।

(উঠ) গোপীনাথ মোর প্রাণর ঈশ্বর। পাহিলানি নিশি প্রভু উঠ রাধাবর॥ কবাট ফিটাই কৃষ্ণ কহি মূর্চ্ছা গলা। মধুদাসে তোলি ধরি প্রভুরে চাহিঁলা॥ বসি পড়িছন্তি প্রভু গোপীজন পথে। দাস সেবা লোভে আসে এ বিচিত্র গতি॥ শুনি প্রভু নেই সঙ্গে বৈষ্ণব মণ্ডলী। তোটা গাপীনাথে দর্শন সুমরি॥ কহন্তি গৌরাঙ্গ হসি পণ্ডিত বরেণ্য। তোর পাইঁ বসিছন্তি আম্ভর শরেণ্য॥ যাবত ইয়ে জীব থিব সেবা করু থীব। তুম্ভর সেবার লোভা নন্দর নন্দনে। রাজা প্রজা সর্ব্বে যান্তি অপূর্ব্ব দর্শনে॥ নাম ঘোষে পুরী গলা ভুবন কানন। ভাবগ্রাহী ভাব অনুসারে করি লীলা। এতে প্রভুর মহিমা জগতে ব্যাপিলা॥

অমাবস্যা দিন প্রভু বেড়া সংকীর্ত্তনে। গমন্তি মেরদা গৃহে বিশ্রামন্তি জনে।। দশ দশ পসরারে উপন পসরা। আনন্তি নৈবেদ্য মান সুগন্ধরে ভরা।। প্রভু বোইলে কি ভোগ বিশেষরে সার। শিখি কহিলে এ অটে সপ্তপুরী ভার।। যথা অন্নকূট এহি পূর্ণ নীলাচলে। শকট প্রায় পিষ্টক প্রভুঙ্ক সমীপে। রখন্তি শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিরে বড়ু এ প্রত্যক্ষ্যে। তাট মান দেখাইলে নেই সে ছামুরে। মুণ্ডে লগাই কৈবল্য তুণ্ডরে ধরিলে।। বোইলে এ তাটকার নৈবেদ্য সম্ভার। শুনিলে প্রসাদ অটে জগন্নাথঙ্কর।। হসি গোরা রায় দিয়ন্তি উত্তর উচ্চরে। দেখ পিষ্টক উপরে লক্ষণ নিকরে।।

শঙ্খ চক্র জ্যোতি যার পর দেখ সর্ব্ব। শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ এহু দেবঙ্কু দুর্লভ।। হল মুষল চিহ্ন যে বড় ভয়ঙ্কর। রাধার দেখ প্রসাদ কমল আকার।। সর্ব্বে দেখন্তি উপনে সেই মত চিহ্ন। এক ভোগ তহিঁ ভিন্ন আয়ুধ লক্ষণ।। সপ্তপুরী উপনরু প্রসাদ পাইলে। পুরডাশ মানঙ্করে শ্রীকৃষ্ণ লক্ষণ। দেখাইয়ে জগতে গোরা ভক্তি প্রভাবিণ।। অহমুনিয়া পরীক্ষক প্রত্যক্ষ দেখিলে। রাজগুরু বিষয়ঙ্কু আনি দেখাইলে।। পিঠারে বিষ্টু লক্ষণ দেখি ক্ষেত্রবরে। ধন্য হলু গোরা (চাঁ) দ অপার কৃপারে।। পরিছা রাজাজ্ঞা বলে পাচকাঙ্কু রাই। দশ ভার পিঠা পন্তি সজাড়িব থোই।। আজ ঠারু জগন্নাথে যে তাট বাড়িব। শঙ্খ চক্র চিহ্ন তহি নিশ্চয় লেখিব।। বড়বারে রখিবসে হলমুষল কু। ভাস্বতীক ভোগের পদ্ম রাখিব বিধিক।। এহি বিধি প্রমাণরে সাত পুরী হেলা। উপনরে বিষ্টু চিহ্ন বিধান হইলা।। গৌরাঙ্গ মহিমা ক্ষেত্রবরে বিস্তারিলা।।

শব্দার্থ ঃ—উপন—একপ্রকার প্রসাদ।
পুরডাশ—পিঠা।

নৃসিংহ ছামুরে বেদি ব্রহ্মাসন। কাষ্ঠ মণ্ডপকু ভাঙ্গি প্রতাপ রাজন ॥ গোদাবর আদি সর্ব্ব শাসনিক বাঞ্ছা। প্রতাপ পুর দানান্তে ভূসুরক ইচ্ছা ॥ শক চউদশ চউবন বর্ষ শুভে। গঢ়াই মুক্তমণ্ডপ প্রশস্ত বিভবে ॥ নানামূর্ত্তি লহড়া রে শিল্পী এ রচিলে। নৃসিংহ অবতারাদি মুরতি সঞ্চিলে ॥ সেই কালে শিল্পীবর চৈতন্য মুরতি। লহড়া রে স্থাপিলা যে অতি ভক্তিমতী ॥ তাহা দেখি শাসনিয়ে অতি কোপ চিত্ত। ভূসুর মণ্ডপে এ হি মূর্ত্তি অনুচিত ॥ জীবদেব বাধ কি রে মৌনে রহিলে। ভক্তগণে সর্ব্বে রহু বোলিন কহিলে ॥

রাজা কটক মুখামু পঠাই সচিব। সর্ব্ব মত যাহা হইব তাহাই করিব ॥ সেবক পরিচ্ছা সাহিনায়ক বিষয়ি। মঠধারি থিলে যেতে নীতিকু আবরি ॥ সকল জরিব্‌দার সামন্ত আবর। কাশীমিশ্র কহিলে যে সভার মধ্যর ॥ সত্যযুগে তপ ত্রেতা যুগে যজ্ঞাচার ॥ দ্বাপরে সেবা কলিরে নাম মাত্র সার। নামর প্রচারে যে বা জগত তারিলে। তাহাকু ভকত জনে শ্রেষ্ঠ রূপে নেলে ॥ মুকুত মণ্ডপ পাপ সন্তাপ হারক। শ্রীচৈতন্য অটন্তি হরিনাম প্রচারক ॥ কেবা আসি মঠ করি উপাধি ঘেনিলে। গোরা রায় জগতর অঘনাশ কলে ॥ জগন্নাথ প্রিয় মহাপ্রভু নাম বহিছন্তি। মণ্ডপে রহিবা পক্ষে উচিত মনন্তি ॥ রাজা সর্ব্বমত পাই সিউকার কলে। কটকরু সর্ব্বমতে আজ্ঞাপত্র দেলে ॥

শব্দার্থ ঃ—ব্রহ্মাসন—মুক্ত মণ্ডপ, লহড়া—ছাত, সঞ্চিলে—স্থাপন করিলে, বাধকি—অসুস্থ।

উপাধি—রাজকীয় সম্মান, সিউকার—স্বীকার।

চৈতন্য কীর্তন গোষ্ঠী রখি শিল্পীবর। মুকুত মণ্ডপ শোভা বঢ়াই নিকর ॥ নাম ভক্ত শ্রেষ্ঠ, ভাব মুরতি সে গোরা। ব্রাহ্মণ ভট্ট মিশ্রঙ্ক চিত্ত রস কলা ॥ বৈষ্ণব ভূস্মুরে সর্ব্বে মিলি নাম কলে। কাশী মিশ্র মণ্ডপরে ব্রহ্মভোজ দেলে॥ দিনে বিচারন্তি প্রভু চৈতন্য ঠাকুর। সার্বভৌম মহাশয় নু হন্তি তাহার॥ দিনে পচারিলে প্রভু কুহ কৃষ্ণ কথা। নীলাচল লীলারে যে সর্ব্বোত্তম গাথা॥ কহন্তি সে সার্বভৌম শুন হে গোসাইঁ। কার্ত্তিক মাসরে বাঢ় ধূপ··· ॥

রাধা দামোদর একো অঙ্গ জগন্নাথ। তেনু দামোদর পূজা বিশেষ বিখ্যাত। একো তলিছ প্রভুঙ্ক ফুলগুণা নেই। দাসী মুণ্ডে দেলা তাহা তার মন মোহি॥ নিশঙ্ক ভানু যে রাজা দরশনকু বিজে। ফুলতাট ঘেনি বাকু উভা হেলে সেজে॥ দাসী মুণ্ডু আনি তাঁকু ফুলগুণা দেলা। বাঢ় বাহরন্তে রাজা ত্বরিতে কুপিলা॥ বামদেবাচার্য্য তাকু মরণ জোগাই। কহিলা দৃঢ় ভক্তিরে মোর দোষ নাই॥ প্রভুক শিররে বাঢ় দেখি ধন্য হেলা। দেখ প্রভু ত্রিমুণ্ডি অছি কেনা বাঢ়॥ রাজা ভক্তি ভরে প্রভু মস্তক দেখিলা। বাঢ় থিবারু কার্ত্তিকে বাঢ়ধূপ কলা। ভকত বল্লভ প্রভু জগত স্বরূপ॥ কার্ত্তিকর বালধূপ নোহে বাল্য ভোগ। মধুর কীর্ত্তন লীলা সার্বভৌম কহি॥ গোরা ভট্টাচার্য্য মন নেলে তথি মোহি॥

শব্দার্থঃ—ব্রহ্মভোজ—ব্রাহ্মণ ভোজন, কুহ—কহ, গাথা—চরিত, ধূপ—ভোগ, বাঢ়ধূপ—বাল (কেশ) ভোগ।

তলিছ—একজন পরিচ্ছা, ফুলগুণা—পুষ্পের নাসালঙ্কার, দাসী—রক্ষিতা স্ত্রী, উভা—উপস্থিত, ফুলতাট—পুষ্পপ্রসাদ, বাঢ়—কেশ, ত্বরিতে—শীঘ্র, বামদেবাচার্য্য—তৎকালীন রাজগুরু, ত্রিমণ্ডি—শীর্ষদেশ।

গম্ভীরা পতির উপরে আজ্ঞাপত্র দেলে। বালধূপ সংকীর্ত্তন গায়নে বন্নিলে ।। কার্ত্তিক মাসর নাম অধিকারী হেলে। গঙ্গামাতার কীর্ত্তন দেউলে ঘেণিলে ।। মহাসংকীর্ত্তনে সার্বভৌম, গৌর। ক্ষেত্রবাসী ধন্য হেলে দেখি শোভা সার ।। ছত্র তরাস চামর সিদ্ধি দিয়াইলে। আপনে ত্যাগী সন্ন্যাসী ভূমিরে লুটিলে ।। গম্ভীরারে সর্ব্বজন চকিত হইলে। দাস্তিক সংকীর্ত্তনরে জগত মোহিলে ।। মহাবৈষ্ণব মণ্ডলী গম্ভীরারে হেলা। হরিদাস শীর্ণ দেহ ছাড়ি বোইলা ।। ভাদ্র শুক্ল চতুর্দ্দশী পুনর্বার আসি। মিলন্তে সে হরিদাস মহামন্ত্র রটি ।। দেখ গৌরধন মোর, মণি মো নেত্রর। তার সুখ দেখি দেহ ছাড়িব তামর ।। গৌরাঙ্গ ঠাকুর চলে ব্যগ্র ভর হোই। জগন্নাথ খণ্ডুআ মালা গলে দেই ।। মুখে নির্মাল্য কণিকা নেই নামগাই।

হায় প্রিয়জর্ন বলি ভূমিরে লুটিলে। উঠি তাঙ্ক কৃশ তনু গৌরাঙ্গ তোলিলে ।। সংকীর্ত্তনে ঘেণি গলে স্বর্গদ্বারে ত্বরা। হরি হরি হরিদাস মুখে উচ্চারন্তি ।। শাক্ত আসন সম্মুখে রথ হে বোলন্তি। কৃষ্ণ কোলে থাই কৃষ্ণ ভকত শেখর ।। জীবন ত্যজিন, মুখে নাম নিরন্তর ।। নিজ হাতে শুয়াইলে গৌরাঙ্গ সুন্দর। সেহি দিনু সিংহদ্বারে ভিক্ষা আচরিলে ।। সর্ব্ব ভক্ত জনে হরি কৈবল্য ভেটিলে ।। নিজ হস্তে দেই তাঙ্কু গোলক সমাধি। গম্ভীরারে তিনি মাস মৌনব্রত সাধি ।। নীল-শৈলনিকটে নিকেতনম্। নন্দনন্দনম পাদাব্জ সেবনম্ ।। হরে তব উচ্ছিষ্ট ভূরি ভোজনম্। শ্রেয়ং মম তব নাম কীর্ত্তনম্ ।। এহি মতে গৌরচন্দ্র দিন যায় সরি। নাম প্রবাহরে কলি জীবঙ্কু নিস্তারি ।। মৌনব্রত ভঙ্গ কলে পউষ মাসরে। বাৎসল্য মমতা ভোগ পহিলি ভোগরে ।।

শব্দার্থ ঃ—আজ্ঞাপত্র—হুকুমনামা, তরাস—শোভাযাত্রার বিশেষ অলঙ্কার।
শাক্ত আসন—মঠ, ভেটিলে—উপহার দিলে, পউষ—পৌষ।

রাত্রি অবসানে ঘেনি সেবক সমাজ। কৈবল্য পসরা ঘেনি মিলি ন্যাসীরাজ ॥ দণ্ডবত করন্তে যে গৌর কোল কলে। হরিদাস গলে দেখ কৃষ্ণর মন্দিরে ॥ প্রেমর মধুর বাণী নাথঙ্কু কুশল। পচারন্তি নেত্র যুগ্ম বহে অশ্রুজল ॥ জয় গোরা জগন্নাথ বিদগ্ধ মুরতি। কহি বাহুড়িলে সর্ব্বে সেবারে সুমতি ॥ ডাকিলে বৈষ্ণবগণ সেবক গোবিন্দ। পহলি ভোগ প্রসাদ পাও দিব্যানন্দ ॥ স্বরূপ কুড়িয়া ধরি রায় মহাশয়। প্রভু পরশন্তি রঘুনাথ নামর আশ্রয় ॥

প্রভু সার্বভৌম পিণ্ডিরে বসিলে। আসন সমস্ত পিণ্ডি পারুশে রাখিলে ॥ কহিলে প্রসাদ করে নেত্র থন থন। মনে থিব ভাগবত লীলার কথন ॥ গো গোষ্ঠে মাতার পুড়া খোলি গোপ বালে। একত্র কৈবল্য পান করিলে সে কালে ॥ নাহি জাতি পাঁতি কুল জ্ঞানর বড়াই। কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট সুখ বর্ণনে ন জাই ॥ শুষ্ক হেউ পচা অবা পর্য্যুসিত। শ্বপচগৃহরে মধ্য কৈবল্য ভুঞ্জিত ॥ দেশকাল জ্ঞান এথি কদান জোগাই। পাইবা মাত্রকে পাই শিরে হস্ত দেই ॥ কুড়িয়া ধাররে যেঁউ কণিকা লাগিছি। পাইলে সে অন্ন পাপ নথি বটি কিচ্ছি ॥ বড়ি ঝড়া চূড়া ভজা খেচুড়ি গোলাই। শুক পিণ্ড প্রায় সর্ব্বে দেলেক তা পাই ॥ কৈবল্য পাইন মুখে মুণ্ডে কর বোলি। সাধুসাবধান বাক্য পড়িলা উছলি ॥ সনাতন গদাধর ভাবে নৃত্য কলে। জয় মহাপ্রসাদর নাম প্রসারিলে ॥ প্রদ্যুম্ন পণ্ডিত তহিঁ কহে জোড়ি কর। অস্নাতরে অমার্জনে করিলে আহার ॥

শব্দার্থঃ—কুড়িয়া—রন্ধনের মৃত্তিকাপাত্র, পরশন্তি -পরিবেশন করা।

পুড়াখোলি—পুঁটলি খুলে, পাইবা মাত্রকে—পাওয়া মাত্র, পাই—খাই, গোলাই—গুলে নিয়ে।

প্রভু কহে এহি সর্ব্ব শৌচর মূল। পুরী ভারতী পুছিল প্রভু গোরা রায়··· ।। হরিবাসরে ভোজনে নোহে অন্তরায়।। প্রভু কহে শুন একাদশী ব্রতমধ্যে সার। কাল যায় সংকীর্ত্তন অভুক্ত শরীর।। ধরি নাম সংকীর্ত্তন তাহা গুণ গাই। করে থিব একাদশী তিথিক বিতাই।। দ্বাদশী পারণা রূপে তাহাঙ্কু ভক্ষিব। অন্যথা তক্ষণ মাত্র কণিকা সেবন ।। কৈবল্য সেবন দোষ নোহে কদাচন।। হরিবাসরে ভোজনবর্জিত নিশ্চিত। রাত্রি নিদ্রা বিবর্জিত নাম অবিরত ।।

শম্ভু সোমবার দিন হরিবাসর রে। করন্তি নির্মাল্য সেবা ক্ষেত্রে নিরন্তরে॥ বৈষ্ণব অগ্রণী শিব আচরণে দেখ। কৈবল্য প্রাপ্তিরে কৃষ্ণ প্রাপ্তি মহাসুখ ।। তুলসী জাহ্নবী বারি হরি পাদোদক। কৈবল্য এ চারি সম বিচার রহিত। গুরু পাদোদক পান পবিত্র করই। তাহা মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবে বিষ্ণুব্রতে নেই।। নাম ব্রহ্মে কাল জ্ঞান বিচারতে মন।। পাট মহাদেই শিক্ষা দীক্ষা প্রদায়ক। ভাগবতী জগন্নাথ চরণ সেবক ।। জগন্নাথ বিপ্র সেহু বৈষ্ণব গোসাই। চৈতন্য গৌরাঙ্গ সঙ্গে আকুলিত হই ।। নিত্য প্রভু কলা দেউলরে দরশন। বাহুড়ে গ্রামকু সে সন্তোষ মন ।। রাধাষ্টমী তাঙ্ক অটে জনম বাসর। শ্রীচৈতন্য প্রণামব্রত লইয়া হৃদর। বেড়াসংকীর্ত্তন সারি গৌরাঙ্গ। সুন্দর স্তম্ভ উহাড়রে প্রভু রহিল নিশ্চল ।।

শব্দার্থঃ—বিতাই—কাটান

হৃদর—হৃদয়ে, উহাড়রে—পিছনে।

দক্ষিণ পার্শ্বে জগন্নাথ দাস থিলে। ভাবাবেশে মুরতিকু ভাবে নিরেখিলে ।। অপূর্ব্ব হৃদয়াবেগ প্রভুরে নিরেখি। ধ্যানার্চ্চনা কালে হেলে অন্তররে ছুখি।। সিদ্ধ বকুল কুসুম কৃষ্ণমন্ত্র খিয়াই। মানসে গুন্থিন দিয়ন্তি ইষ্ট গলে নেই।। ধ্যানপথে দেখিলে যে গণ্ঠি অছি পড়ি। ন' গলুছি ত্রিমুণ্ডিরে দুঃখী চিত্ত চাড়ি।। সন্তাপ মানসে হৃদয় আবেগ বাঢ়ই। বেপথু শরীর নেত্র লোতক ঝরই।। ভাবে জানি ভাগবতী বিনয় বচন। কহে পায়ে পড়ি, ক্ষম ধৃষ্টতা মোহান।। জগন্নাথঙ্ক মালারে গ্রন্থি ন পড়ই। কাহার আবদ্ধে প্রভু তাঙ্কু ন জোগাই।। গ্রন্থি থিবাকু হে প্রভু ভুবন সুন্দর। গলে গলু নাহি মালা এহি হেতুর বিচার।।

ক্ষম অপরাধ মোর গ্রন্থি বিমোচন। করি মালা দুই ভুজে পিন্ধাও বহন।। আতুরের ব্যথা শুনি কহিলা এবস্তু। গ্রন্থি বিরহিত মালা লাগির সিদ্ধান্ত।। উত্তরীয় কাঢ়ি প্রভু দাসঙ্ক শিররে। বান্ধি শাড়ি অতি বড়ি নাম দেলে শাখা বিচাররে।। অতি বড়···তুহুঁ ভাগবত প্রাণ। অনেক দিনর আশা করিলু পূরণ।। শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ কোলাকুলি হই। উদ্দণ্ড নৃত্য করিলে জগন্নাথে চাহি।। শাড়ি কণ্ঠি দেলে চৈতন্য ঠাকুর। আরম্ভিল বড়োৎকল মহন্ত বিচার।। মত্ত বলরাম মন্ত্র জ্ঞান থিলে দেই। চৈতন্য কৃপালু আজও সিদ্ধ হেলা তহিঁ।। অন্তরঙ্গ ভাগবতী জগন্নাথ দাস। অতিবড় গোসাইঁরে হুইলে প্রকাশ।।

শাব্দার্থঃ—খিয়াই—ধ্যানের দ্বারা, গুন্থিন—গ্রন্থি, গণ্ঠি—গ্রন্থি, চাড়ি—চালানো, লোতক—অশ্রু, হেতুর—কারণে।

বড়োৎকল—বড় উৎকল।

শ্রীচৈতন্য গুরু পরম্পরা খ্যাত হেলা। শাখা প্রকাশনে সর্ব্বে আনন্দ লভিলা ।। নৃপর আগরে ছামু করণ কহিলা। সকল বৈষ্ণবগণ জয় জয় কলা ।। ছুই মহাপুরুষক মিলন মধুর। সেবকে করিলে মঠে উৎসব বিধির ।। প্রতাপ নরেশ ইহা বড় পণে নেই। একাদশী দিন শাড়ি দেলাক পঠাই ।। পরমানন্দ আনন্দে বার লাগি দেলা। চৈতন্য ছামুরে নেই নিউ ছাড়ি নেলা ।। সত্তাইস বৈষ্ণবে যে উৎসবে মিলিলে। সিংহাসন মার্জনরে সঙ্গে সেবা নেলে ।। কণক মুণ্ডাই সেবা পাট দেই কর। গুরু পদে সমর্পিল সেবা গুরুতর ।। রাধাকান্ত গোপীকান্ত ছুই পীঠমূল। নাম প্রচার ভকতি এ পিঠ সম্বল ।। মহানায়ক পণকু উভয়ে ভাজন। গোরা সিদ্ধি অভিমান ত্যজিল তক্ষণ ।।

এই কথা উড় দেশে প্রচার হুইলা। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, কীর্ত্তি মহত্ব লভিলা ।। হরে কৃষ্ণ রাম পুন হরে রাম কৃষ্ণ ।। সমান করি ক্ষেত্ররে হুইলা সন্তোষ ।। গৌড়ীয়া উড়িয়া ভাব ত্যজিল সকলে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কৃপা বড় ফলে ।। রাজ উপচারে ছুই আস্থান বেড়িলা ।। বৈষ্ণব জন নম্রতা গুণে কেহ ন' ঘেণিল ।। কুমার পূর্ণিমা কালে বিজে অবকাশে। নগর কীর্ত্তন চারি আশ্রম নিবাসে।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস জগন্নাথ দাস রহি। সকল বৈষ্ণবগণ মহামন্ত্র গাহি ।। অঠর খোলরে চৌদিগ হেটিলা। হরি লুটি সিংহদ্বারে সেবকে রচিলা ।। রাজপুর-বর্গে ছুই মত প্রকটই। কহে শ্রেষ্ঠ জগন্নাথে কে চৈতন্য কহই ।। কার্ত্তিক কৃষ্ণ চতুর্থীরে যে প্রবল বতাস। আসি ন পারন্তি ঘরু সেবক বিশেষ ।। রোসরু বৈঠা থাই প্রদীপ জড়িলে। মঙ্গলারতি হেব পরখ বোইলে ।।

শব্দার্থ ঃ—সত্তাইস—সাতাশ, দেই—রাণী

হেটিলা—কম্পিত হ'ল, রোসরু—পাকশালা, বৈঠা—প্রদীপ, বতাস—ঝড়।

আরতি বেড় গড়িলা ভগতে বেড়িলে। প্রদীপ থইন সর্ব্বে হতাশরে থিলে॥ এ সময়ে শ্রীচৈতন্য ঠাকুর কীর্তন। আসিলেক দাস জগন্নাথ মহাজন॥ করণে বোইলে এবে পরীক্ষা করিবা। বইঠা দেইন সাধ্য সাধন জানিবা॥ আখণ্ডল পাত্র বলে ঠাকুর শুনিবা। বইঠা ন জাএ বাতে সে বা কি করিবা॥ হরি প্রভু গৌরচন্দ্র করে ধরি দীপ। সংকীর্ত্তন মধ্যে নৃত্য কলে অনুরূপ॥ প্রখর পবনে দীপ কররে জড়ই। নৃত্য সঙ্গে নৃত্য করে দীপ শিখা তহিঁ। জগন্নাথ মধ্য এক বইঠা ধরিলে॥ চৈতন্য গোসাইঁ নাম মধ্যে মজ্জি গলে॥

অখণ্ড সে দুই ধরি দুই মাহাজন। জগমোহনে পশিলে সহাস্য বদন॥ জয় বিজয় দ্বার রে বইঠা রাখিলে। মুদ দেখি সেবকে যে কবাট ফেইলে॥ দুহেঁ অপ্রাকৃত কর্ম করি সিদ্ধ হেলে। অগণিত জন আসি দর্শন করিলে॥ পরিচ্ছা বোইলে এহা নো হে সাধারণ। সাধুঙ্ক করে বইঠা দেবার প্রমাণ॥ রাজাজ্ঞারে এহি সিদ্ধি কালকু রহিলা। দুই গাদির কীর্ত্তিকে অখণ্ড জ্বলিলা॥ বইঠা সিদ্ধিকু গম্ভীরাক পাঞ্চবাটি। উড়িয়া মঠকু খঞ্জা বগায়ত গুটি॥ বিযয়ি সিদ্ধি লভিন বইঠা জড়াই। পরম সে বৈষ্ণব দুহুঁ সাক্ষাত বোলই॥ এক কৃষ্ণ-ভাব রাধা হাবর বিগ্রহ। অন্যে রাধাভাব কৃষ্ণ গুণর প্রবাহ॥ জয় জয় করে ভক্তগণ দুহুঁ নেলে।

শব্দার্থ ঃ—জড়ই—জ্বলছে, জাএ—যায়।
ফেইলে—খুলিলে, বগায়ত—বাগান, হাবর—ভাবের।

সার্ব্বভৌম জগন্নাথ কার্ত্তিক মাসরে। বালধূপ সংকীর্ত্তনে নৃত্য সেবা করে॥ খনতা যে বইরখ তুহি করে শোভা। সংকীর্ত্তন পতি এ'ত গৌরাঙ্গ বিভবা॥ মার্গ শির পঞ্চমীরে সে দাসী লাবণ্য। ছাড়িলা নিযোগপতি প্রভুর শরণ্য॥ গৌরীদাসী রায় মতে সম্প্রদা প্রধান। লাবণ্য গমিলা, পঙ্গু নৃসিংহ চরণ॥ নৃসিংহ বল্লভ বনে গলা প্রায়োপবেশন। গায়ে সে গীতগোবিন্দ মধুময় স্বন॥ দইবে প্রভু ঘেনিন সংকীর্ত্তন ধরি। তোটা গোপীনাথে বিজে দরশন করি॥ শুনিলে সে 'সা—বিরহে তব দীনা' স্বর। পথরে স্থানু পরায়ে রহিলে সত্বর॥ সকল পদ সরিলা প্রভু ভাষে গির। কে গাবই মধুস্বরে হরি রস সার॥

পথে পঙ্গু নৃসিংহ তোটারে পশিলে। লাবণ্য দেখি প্রভুঙ্ক শরীর ছাড়িলে॥ প্রভু বোইলে সে বৈষ্ণবী নোহে ইতরজন। নেই সধবা রত্তনে কর হে কারণ॥ থোকা এ কীর্ত্তন করি স্বর্গদ্বারে নেই। কহ্নাই যে জমিদার কৌড়ি গণই॥ উদ্ধারি যে দাসী আপে প্রভু নন্দসুত। গোপিনাথ দরশনে সুখ অপ্রমিত॥ কুসুম পরশে পট নিস্তরিল্লা প্রায়। দাসী তরি গলা রায়মতে কলা থয়॥ গোপিনাথ লউটানি গম্ভীরারে বসি। বোইলে প্রচার নাম দৃঢ়ব্রতে পশি॥ সকল ভকত গণঙ্কু সমীপে ডাকিলে। প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে আসিয়া মিলিলে॥ তাঙ্করি বদনে মুই অপ্রকট হেবি। অঠরো বরষ সঙ্গ সুখ মু লভিবি॥ তুমর অছি যে কথা ইচ্ছি কর পুছা। কহিব সিদ্ধান্ত মান পুরাইব বাঞ্ছা॥

শব্দার্থ: খনতা—খনতা প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গে যায়, বইরখ—ধ্বজা, স্বন—স্বরে, দইবে—দৈবে
অপ্রমিত—অতুলনীয়, লউটানি—ফেরার সময়ে, হেবি—হব।

সকল আতুর হই করন্তি রোদন। ইচ্ছাময় তব ইচ্ছা কে করিব আন ॥ জল বিনু মীন প্রায় হইব আকুল। ছাড়িছু সকল পাদপদ্মত সম্বল ॥ তব বিনু আন প্রভু নাহি আন গতি। তব চরণ কমলে থাউ আন্ত মতি ॥ গূঢ় উপদেশ দেলে প্রাণর ঠাকুর। বৈষ্ণব গতি বৈষ্ণব জান নিরন্তর ॥ গতি কৃষ্ণ প্রাণ পতি প্রভু জগন্নাথ। সেই বৈষ্ণবর প্রাণ সেবা সারপথ ॥ তাঙ্ক শ্রীঅঙ্গরে মিলি মুই থিবি রহি। কাল কালকু বৈষ্ণব সঙ্গ সুখ বহি ॥ যহিঁ নাম সংকীর্ত্তন তহিঁ মো নিবাস। জান মোর পরিকর নিশ্চিত এ ভাষ ॥ শিখি যাই বালি নবররে প্রবেশিলা। ত্বরারে মণিমা বিজে কর গম্ভীরারে। দেবার্চ্চনা করি নৃপ ত্বরিতে আসিলা। পিণ্ডিতলে সাষ্টাঙ্গ রে প্রণিপাত কলা ॥

নামর মহত্ত্ব পুন প্রেমর লক্ষণ। কহন্তি প্রভু বিস্তারি গদগদ স্বরিণ। ভক্তি শ্রেষ্ঠ সাধন (মানঙ্ক) উত্তম। হেতুকি কি অহেতুকি অনন্যতা জান ॥ নাথ ঠারে প্রাপ্তি ইচ্ছা হেতু কি বিকার। কামনার নাই অন্ত দোষগ্রস্ত সার ॥ প্রাপ্তি পরে পুনি কাম জাগই মানসে। অহেতুকি নিষ্কাম যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে ॥ নিত্যকর্ম্ম প্রায় করি দিব্য কর্ম্ম সার। অবশ্য লভন্তি কৃষ্ণ প্রাণর ঠাকুর ॥ নিত্য কর্মে অবসাদ প্রসাদ অটই। অহেতুকি হেতুকিরে পরিণত হোই ॥ অনন্য অটই প্রেম ভক্তির প্রমাণ। নাহি প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির লেশ বিলক্ষণ ॥ বিধু আকাশরে মহোদধি পৃথিবীরে। নাহি মিলন বিরহ সম্বন্ধ বিধিরে ॥ তথাপি সাগর চন্দ্র মিলন তৎপর। প্রেমী প্রেমাস্পদ ভাব এহি পরকার ॥ এহি মতে বহু তত্ত্ব প্রভু প্রকাশিলে। নৃপর গলারে ছড়া মাল লম্বাইলে ॥

শব্দার্থ : - ছাড়িছু—ছেড়েছি, থাউ—থাক, থিবি রহি—থাকবো, কালকালকু—কালেকালে, বালি নবররে—রাজবাটী, ত্বরারে—শীঘ্র, মণিমা—রাজা, বিজে—যাও। পরকার—প্রকার।

ভূমিরে প্রতাপরুদ্র ব্যাকুলে লোটই। রায় রামানন্দ থএ কলে প্রভুঙ্ক সন্তালই॥ রাজা কহে জোড়ি কর জগত ঠাকুর। কহন্তু প্রভু বশম্বদে কি করিবি আজ্ঞা কর॥ নাম ছাড়ি অন্য গতি নাই এ জীবর। জগন্নাথ সেবা নাম কর্ত্তব্য তোমর॥ গোসাইঁ গণঙ্কু ক্ষেত্র বাসর মর্য্যাদা। নাম ধর্ম্ম প্রচাররে যেহু থান্তি সদা॥ নিত্যানন্দ প্রভু পদে প্রণিপাত করি। সুন্দরা সাহিরে ভূমি দেলাক বিচারি॥ রাণী যেনামণিঙ্কু যে, নাম দীক্ষা দেব। কুলগুরু রূপে ভূমি ভোগ করতিব॥ অদ্বৈত প্রভুরে রাজা বহুমান কলা। দেউল মণ্ডপ সাহি বাড়ে ভূমি দেলা॥ প্রভুঙ্ক কোঠ ভোগ কর্ত্তৃত্ব সম্পিলা। জগন্নাথ ভোগর পরিচ্ছা বোলাইলা॥

সনাতন গদাধর করিন বরণ। তোটা গোপিনাথ টোটা সমর্পিলা পুন॥ পন্তা ভূমি দান করি কৃতকৃত্য হেলা। সুবর্ণ উপাধি ধারি দেব ব্রহ্মচারি॥ মাগু পণে ছুই বাটি ভূমি খঞ্জা করি॥ দেবস্নানে জড় বিজে তার অধিকার। রত্ন সিংহাসন সেবা দেলা-নৃপবর॥ গোপাল বল্লভ দেলা গোপাল ভট্টকু। গোপাল বল্লভ ভোগ পরিছা পনকু॥ আহুলা গোস্বামী বরি চষা পোড়া দেলি। কীর্ত্তনর অধিকারী কলে ক্ষেত্রবরে॥ অতিবড়ি গোসাইঙ্কু কনক মুণ্ডাই। সেবা সমর্পণ কলা পাট মহাদেই॥ জগন্নাথঙ্ক আসনে দেলা অধিকার। গোসাইঁগণ করিলে সর্ব্ব অঙ্গীকার॥ আকুল প্রতাপরুদ্র প্রণিপাত হোই। প্রভু অদর্শন ক্ষেত্রে রহিবি কিম্পাই॥ রথ সংকীর্ত্তন প্রভু হেরা বঢ়াইলে······। বিরহাকুল বদন নেত্র থন থন॥ মৌন কাতর চিত্ত কম্পে অপঘন॥

শব্দার্থঃ—থএকালে—স্থির করে, সন্তালই—সামলালে, যেনমণি যুবরাজ, কোঠভাগ—রাজভোগ, সম্পিলা—সমর্পণ করিলেন, পরিচ্ছা—প্রধান কর্মচারী। বোলাইলা—নামে অভিহিত হল।

তোটা—নাম, টোটা—বাগান, পন্তা—সমুদ্রতট, খঞ্জা—দান, জড়বিজে—স্নান যাত্রায় জল নেবার পদ্ধতি বিশেষ, গোপালবল্লভ—বাগিচার নাম, ষাপড়া—একটি গ্রামের নাম, কণকমুণ্ডাই—সিংহাসনের উপরিভাগ, কিম্পাই—কেন, হেরা—বিশেষ উৎসব, বচাইল—শেষ করিল, অপঘন—ঘনঘন।

চতুর্দ্দশ ষষ্ঠাধিক পঞ্চশত শাকে। অপূর্ব্ব লীলা ঘটিলা প্রত্যক্ষে॥ শুক্ল সপ্তমী তিথি যে অবশ কইলা। আতুর ভাবরে গোরা কীর্ত্তনে গমিলা॥ আড়প মণ্ডপে চারি সম্প্রদায় সহ। উদ্দণ্ড নর্ত্তন অস্তব্যস্ত প্রভু দেহ॥ গোবিন্দ স্বরূপ দুহুঁ আকুলিত তনু। শ্রীঅঙ্গ সম্ভালিবারে চকিত সুতনু॥ পাদুক কুণ্ড সমীপে বেঢারে বসিলে। বিরহ কীর্ত্তনে সর্ব্বে অসম্ভাল কলে॥ ফিটি বহির্বাস গলা মালা অসম্ভাল। মহারাসস্থলী রাসগীতে অনর্গল॥ সর্ব্ব নেত্র তার পূর্ণ আকুল বদন। রায় পাশে বসি করে আকুলে ক্রন্দন॥ মৃদঙ্গ বেতাল স্বর কাতরে বেতাল। সর্ব্বে অনুভব কলে সম্বরণ কাল॥

সন্ধ্যা আরতি দরশনে সেবকে রাইলে। বিজে দ্বার দেই গলে গৌরাঙ্গ ঠাকুর॥ গরুড় স্তম্ভ সমীপে দরশনে আতুর॥ সন্ধ্যা আরতি উঠিলা পড়িলা চহল। ছিণ্ডি পড়িলা প্রভুঙ্ক অধরর মাল॥ সহসা শতেক চন্দ্র উদিয়ার তেজ। প্রকাশরে নেত্র সর্ব্ব কি ঘটিলা আজ॥ দিব্যজ্যোতি প্রায় তেজ গরুড় পছরু। জগন্নাথ ছামু যাতে পড়ে ধাতি কারু॥ হরি হরি জয় নীলাচল পতি জয় জয়। শবদে আড়প কম্পে ন' ধরিলা থয়॥ স্তম্ভ পাশে থিলে প্রভু ন' দিশে বদন॥ কেনে গলে ভক্ত সর্ব্ব আকুলিত মনে॥ কেহ বোলে সিংহাসন পথে অবাগলে। প্রতিহারীগণে বাক্য অস্বীকার কলে॥ আকুলে খোজন্তি সর্ব্বে বৈষ্ণব মণ্ডলী। দেখিলে নিরেখি আড়পর বনস্থলী॥ কেহ বোলে ইন্দ্রদ্যুম্ন সর পথে গলে। খোজিন স্বরূপ তথি নিরাশ হইলে॥ নৃসিংহ বল্লভ আই তোটারে খোজিলে॥ গোবিন্দ সেবক সঙ্গে বৈষ্ণব কেতেক। সমুদ্র পন্তা খোজই করি মহাশোক॥

শব্দার্থ :—আড়প মণ্ডপে—গুণ্ডিচা বাড়ি, পাদুক—পাদোদক।

অবাগলে—সম্ভবতঃ, ন' দিশে—দেখা যাচ্ছে না। বইলে -ডাকলেন, ছামু—সামনে, ধাতি কারু—উপর থেকে।

সেবক ভকতগণ বড় দেউলরে। খোজন্তি সিদ্ধ বকুলে নগর মধ্যরে ॥ অনন্ত সিংহ পাত্র যে অশ্বরে আরোহী। গোরাচান্দ গলে কেনে অবাক কাঁহি ॥ তোটা গোপীনাথ তাঙ্ক প্রিয় স্থলী। রায় বোলে অবা থিবে ধর্ম সেহি স্থলী ॥ সকলে ধাবন্তি বস্ত্র বেশ অসম্ভালি। গোপীনাথ বেঢ়া ঠারে বহির্বাস দেখি ॥ স্বরূপ বৈষ্ণবগণে হেলে মহাসুখি। মাত্রক খেদ ঘটিলা চৈতন্য ন' দেখি ॥

বৈষ্ণবগণ আতুরে করন্তি বিচার। অচেতন গৌরচন্দ্র অচেত শরীর ॥ ভক্তগণ এ স্থানকু আদরে আনিলে। বহির্বাস পড়ি অছি প্রভু কেনে গেলে ॥ এমন্ত সময় রায় রামানন্দ ধীর। শোকরে অধীর হেবা সামান্য বিচার ॥ দেখ অদ্ভুত বস্তু এথারে ঘটিছি। প্রভু অঙ্গবাস মালা এ-ঠারে পড়িছি ॥ গোপিনাথ জানুদেশে ক্ষতর আকার। ন' থিলা ত কদা এহু বিচিত্র ব্যাপার ॥ দৈবী সত্তা দেব সঙ্গে বিলীন লভিলা। একে দেখি প্রভু লীলা সম্বরণ কলা ॥ এতেক সকলে মিলি হরি হরি ক'লে। অবশেষ নেই তথি সমাধি রচিলে ॥ নিজ ইচ্ছা নির্মিত সে অপ্রাকৃত দেহ। জগন্নাথ শ্রীঅঙ্গরে লীন হেবা থেহ ॥ অখণ্ড কীর্ত্তন করি মিলি এহি ঠার। স্বরূপাদি চলিলান্তি গম্ভীরা ঠাবর ॥ বাহুড়া কীর্ত্তন পুনি বেড়া সংকীর্ত্তন। করন্ত এ ঠারে থোকে অখণ্ড শ্রীনাম ॥

সেই মত ভক্তগণ কর্ম্ম আচরিলে। গৌরাঙ্গ অমৃতবাণী গায়ন করিলে ॥ থোকে বেড়া সংকীর্ত্তন করন্তি নিষ্ঠারে। কাতর হৃদয়ে নাম জগাই প্রেমরে ॥ দ্বিতীয়ারে জগন্নাথ মন্দিরে গমিলে। অখণ্ড কীর্ত্তন বিধিমতে শেষ কলে ॥ গৌড় ভক্তগণ নিজ স্বদেশে গমিলে। গম্ভীরারে পাদুকার অভিষেক ক'লে ॥ পাদুকা অটই আন্ত প্রাণর ঈশ্বর। সেহু আজি ঠাকু হেলে গম্ভীরাধীশ্বর ॥ রাধাকান্ত সেবা পাইঁ অন্তরঙ্গগণ। শীতল করিলে সর্ব্বে সন্তাপিত প্রাণ ॥

শব্দার্থ :—অটই—আছে, চউবন—চুয়ান্ন।

নরপতি দারু আনি স্থাপকে অনাই। গৌরাঙ্গ মুরতি গঢ়ি ভাব ভক্তি দেই॥ বালি নবররে করে প্রতিষ্ঠা বিধিরে। সংকীর্ত্তন মহোচ্ছব করন্তি প্রীতিরে॥ অঠষঠি বৈষ্ণবঙ্কু তহিঁ ঠুব কলে। জগন্নাথ দাস প্রভু পাদ্য অর্ঘ দেলে॥ অতুল মহাপ্রসাদ লুটাই সে ঠামে। নাম সংকীর্ত্তন সেবা বথিলেক ধামে॥ সকল ভক্তঙ্ক ঠারু বিদায় আজ্ঞা নেলে। রায় রামানন্দ ঘেনি কটকে ঘেণিলে॥ বৈষ্ণব মণ্ডল গলে যে যাহা ভুবনে। পুরুষোত্তমর লীলা এথি অবসানে॥ নিত্য বেড়া সংকীর্ত্তন বিধিরে চলিলা। চৈতন্য মহিমা ক্ষেত্রে বিদ্যমান হেলা॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ॥ গম্ভীরার এহু নাম সার নাম হেলা। চউবন লীলা মোর সম্পূর্ণ হইলা॥ শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্মে ইহা সমর্পিলে॥ চউবন লীলা মালা লেখি বঢ়াইলে॥ আমি তাঙ্ক কৃপারে ভক্ত সঙ্গ সুখ লভি। কৃতার্থ হইলা জীব মুই ইহাঁ ভাবি॥ গুরু বৈষ্ণব সেবারে জীব ধন্য হেলা। চকড়া লেখন কর্ম সমাপন কলা॥

বালিসাহি ঘনামল্ল পাটনার বাস। পীতাম্বর পিতা মোর ভাই কৃত্তিবাস॥ দেউল করণ পাঞ্জী লেখন বেউসা। রাধাকৃষ্ণ ভাব চিত্তে শরধা মোহর॥ তস্য ভাবময় গোরা রসিক শেখর॥ ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য কৃত্য লেখিবার আশা। বৈষ্ণব বিহনে তাহা লেখিবার নোহি॥ শ্যামনন্দ কুঞ্জমঠে দীক্ষা ঘেণি লই॥ পট্টনায়ক সাঁতরা পদ বদলিলা। গোবিন্দ দাস বাবাজী নাম মোর হেলা॥ দইবে মোহর পত্নী হীরা অজি থিলা। এ জীব গুরু গোবিন্দ ভজি ধন্য হেলা॥ চতুর্দ্দশ অষ্টাধিক পচাশত শকে। চকড়া শেষ করলু করমানু বিপাকে॥ চকড়া পাঞ্জী লেখি ছামুরে জনাই। ক্ষেত্রর চরিত এথি অন্যলীলা নাই॥ নয়নে দেখিন সাধুবাণী অনুরূপ। চকড়া সমাপ্ত কলু আজ্ঞারে প্রত্যক্ষ॥ প্রভু নীলাদ্রি মণ্ডন পদে রখি ধ্যান। চৈত্র শুক্ল নবমীরে লেখন সম্পূর্ণ॥

চৈতন্য গোসাইঁ পদে মোর নিবেদন
ক্ষমা কর নিজগুণে দোষমন ঘেন।

ইতি শ্রীচৈতন্য চকড়া সম্পূর্ণ
জয় গৌরাঙ্গ ইতি···

লিপিকার—শ্রীশ্রীগঙ্গা মাতা মঠ অধিকারী
বাবাজী শ্রীল ভগবানদাস গোস্বামী মোহান্ত
শ্রীশ্রীরসিকরাজ মহাপ্রভুঙ্ক (শ) চরণাশ্রয়

সার্বভৌমাশ্রম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রবাসিন শ্রীরসিকরাজ
শরণ ওঁ, শাকে ১৬৩৪ ভাদ্রপদ অষ্টম্যাম্
সম্পূর্ণ পুস্তক পাঠান্তর ১৭৪৪
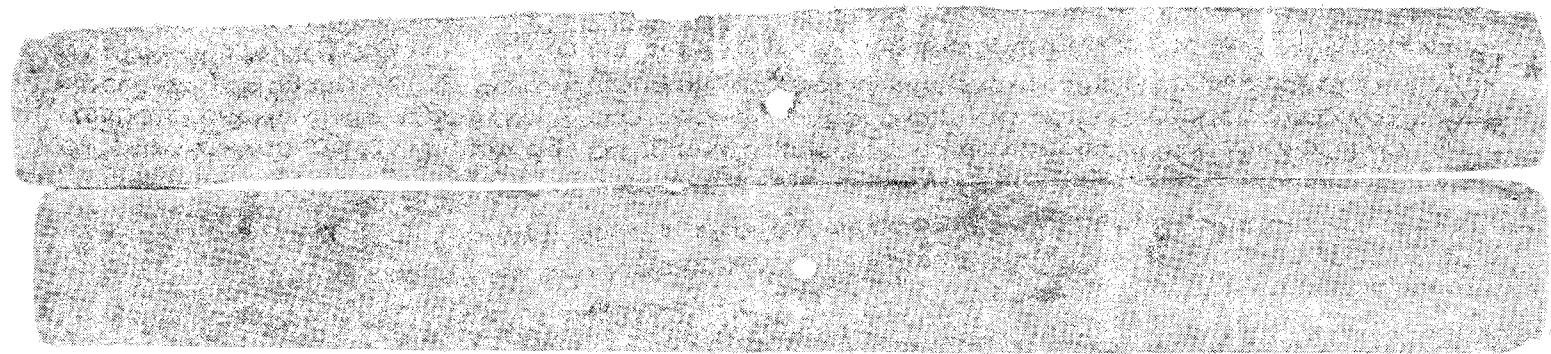
শ্রীচৈতন্য চকড়া মূল পুঁথির মধ্যের ও শেষের পত্র

শ্রীল গোবিন্দদাস বাবাজী বিরচিত

শ্রীচৈতন্য-চকড়া

(অনুবাদ)

জয় জয় জগন্নাথ নীলাদ্রি ঈশ্বর। জয় জয় জগন্নাথ ব্রহ্ম পরাৎপর। জয় জয় জগন্নাথ জগতের পতি। তোমার পাদপদ্মে আমার যেন ভাবরতি থাকে। জয় জয় শ্রীচৈতন্য তুমি নামের অবতার। জয় জয় শ্রীচৈতন্য তুমি ভাবের সম্ভার। জয় জয় শ্রীচৈতন্য তোমার নাম ভুবন মঙ্গল। চিরদিন ঐ পাদপদ্মে যেন আমার মতি থাকে।

তার নাম রূপ গুণ এবং চরিত সবই অপরূপ। আমার পরম ভাগ্য যে সেই চরিত লেখবার সঙ্কল্প জেগেছে। আশা উদিত হয়েছে। আমি গোবিন্দ, কেরাণী কুলে জন্মেছি। বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে আমি দাসপদবাচ্য হয়েছি। কুলমান ত্যাগ ক'রে বৈষ্ণবোচিত দাস্য আনুগত্য নিয়ে এই চরিত লিখছি।

এই শ্রীক্ষেত্রের লীলাভূমিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে লীলা প্রকট হয়েছে শুধু সেইটুকু লেখবার ব্রত আমার মনে উদিত হয়েছে। ভক্তগণের কাছে এ গ্রন্থ 'চৈতন্য-চকড়া' এই শুভ নামে পরিচিত হবে। 'চকড়া' অর্থাৎ আঞ্চলিক ইতিকথা। স্থানীয় ইতিহাস।

শচীসূত নীলাচলে নবলীলা রচনা করলেন। অপ্রকট বস্তু ও তত্ত্বকে প্রকট ক'রে মানুষকে উদ্ধার করলেন। প্রভুর চরিতের তথ্য ও তত্ত্ব আমি আহরণ করেছি। আমার আশা, এই লীলা স্মরণে তাঁর চরণে ঠাঁই পাব। কোন দাবী বা অধিকারে নয়। তিনি স্বভাবে দয়াল। আর আমি স্বভাবে লোলুপ। সেই স্বভাব বলেই তার চরণ পাব আশা রাখি। যেখানে প্রভু যে লীলা আচরণ করছেন আমার জ্ঞান অনুসারে আমি সেই কথাই লিখব। লিখব সেই 'কথামান', কথাখানি নয়। এই কথার মান রেখে, মর্য্যাদা রেখে, পরিমাণ বুঝে ও বুঝিয়ে লিখব।

[কবি সাংকেতিক ভাষায় স্বল্পতম শব্দ ব্যবহার ক'রে দ্রুত লিখছেন। শব্দ চয়নের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য আক্ষরিক অনুবাদ না ক'রে একটু ভেঙ্গে বলার চেষ্টা করছি।]

শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্য ঠাকুর এসে প্রকটিত হলেন। নিজ ক্ষেত্রে এসে পৌঁছলেন। 'পঞ্চক্রোশী পথে' এসে প্রভু উদয় হলেন মন্দির থেকে পাঁচক্রোশ অর্থাৎ দশমাইল দূরে। পৃথিবী বা সূর্য্য কে কতটা ঘুরে এলো আমি দেখছিনা। দেখছি এই মূহূর্ত্তে সূর্য্য এখানে উদয় হল, প্রভু উদিত হলেন আমার দৃষ্টিতে, আমার মানসে।

ভাদ্রমাসের শুক্ল নবমী বুড়ালিঙ্গ পাটনায় প্রবেশ ক'রে সংকীর্তন শুরু করলেন। সংকীর্তন কইল। 'কইল' শব্দটি এখানে যেন প্রবর্তন করলেন অর্থে ব্যবহৃত। সেই সময় কপোতেশ্বর শিব দর্শন করলেন। ভাবাবেশে গৌরচন্দ্র বিভোর হয়ে আছেন। জগন্নাথ কৃষ্ণচন্দ্রের অপ্রাকৃত রূপ স্মরণ ক'রে প্রভু শ্লোক পড়তে আরম্ভ করলেন। বেপথু শরীর। মহাভাব দেখা দিল। অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার একত্রে দেখা দিয়েছে। কোন ভেদ ভাব নেই। দেহ তার কন্টকিত। পুলক শিহরণে প্রতি লোমকূপ কন্টকিত। ভাব দেখে নিত্যানন্দ, প্রভুর সন্ন্যাস দণ্ডটি নিয়ে তিন খণ্ড করে ভেঙ্গে জলে ভাসিয়ে দিলেন। ভার্গবী নদীর জলের স্রোতে তরঙ্গের সঙ্গে দণ্ড ভেসে চলল। ভেসে চলল সন্ন্যাসীর অহংকার, সোহংভার। বৈষ্ণবরা চিন্তা করলেন, এই নদীর নাম দেওয়া হোক 'দণ্ডভাঙ্গা নদী'। এই নদীতীরে ভৃগুর আশ্রমের তটে সেই দণ্ড গিয়ে লাগল।

বুড়ালিঙ্গ পাটনায় নাম সংকীর্তনে মহানন্দে রাত কাটালেন মহাজনরা। সকাল বেলায় ভার্গবী নদীতে স্নান ক'রে আনন্দিত চিত্তে প্রভু ক্ষেত্র পথে চললেন। যেতে যেতে পথে বিরাট মন্দিরের শোভা দূর থেকে দেখেই বৈষ্ণবগণ লোভাতুর হয়ে পড়লেন। মন্দির শিখরে ধ্বজা

দর্শন মাত্রে গৌরচন্দ্র নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন। গজ্ঞ গজ্ঞ গজ্ঞ গজ ব'লে হুংকার করতে লাগলেন। ভাবে গদ গদ। চৌদিক হুংকারে কাঁপিয়ে তুললেন।

পথে হয়তো একজন উৎকলবাসীর দেখা পেয়েছেন। তাকে দেখে, বৈষ্ণবগণ বলছেন, 'তোমরা ভাগ্যবান'। শ্রীক্ষেত্রে তোমাদের বাস। তোমরা জগন্নাথের সহবাসী। সেই পথে অশ্বত্থতরু মূলে প্রভু বিশ্রাম করলেন। ভাবাবেশে প্রভু বুঝতে পারলেন এটি বাট-মঙ্গলা। পথমঙ্গলা। অশ্বত্থতরু তলে এই 'বাটদেবী'কে সবাই জানে। পুলকিত মনে গোরা সেখানে বিশ্রাম করলেন।

সকলকে একত্র ক'রে গোপী আচার্য্য জগন্নাথের পরিহিত বস্ত্রের 'খদি পরসাদ' ও প্রসাদী মালা নিয়ে প্রভুকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করলেন। ভাবে গদগদ হয়ে উঠেলেন। 'ঘাটুয়া', যারা ঘাটে ছাড়পত্র দেয়, 'বাটুয়া', যারা পথের সাথী, 'পৃষ্টি' যারা শুল্ক আদায় করে, 'কটুয়াল' যারা পথরক্ষী সকলে প্রভুর ভাবরূপ দেখে পথে প্রণাম করতে লাগল। যারা দেখছে সকলেই প্রভুর সঙ্গে চলেছে যাত্রায়। ফলমূল পায়স এনে নিবেদন করছে।

শকাব্দ চৌদ্দশ একত্রিশ ভাদ্রমাসের শুক্লনবমীর দিনে, সন্ন্যাসী গোরা রায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, কৃষ্ণ নাম প্রেম প্রবাহে ভাসিয়ে দিলেন। সবাই দেখল সামনে 'অঠারো নলা' সেতু। প্রভু আলম্বা দেবীকে প্রণাম করে ঐখানে রাতে বিশ্রাম করলেন। দ্বাদশ বর্ষ অন্তর জগন্নাথের নবকলেবরের সময় মহাদারু বা ব্রহ্মদারু আহরণ করে আনার পথে এই দেবীর কাছে একটি রাত্রি যাপন করার নিয়ম আছে। পরদিন সকালে শোভাযাত্রা সহ সেই মহাদারু শ্রীমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের যাত্রাও স্বাভাবিক ক্রমে ঠিক এই দেবীর কাছে এসে থেমে গেল একটি রাত্রির বিশ্রামের জন্য।

ক্ষেত্র প্রবেশ কালে যে যে লীলার প্রকাশ হয়েছিল, ক্রমানুসারে সেইগুলি লিখব। পৃথিবীতে কি ঘটে গেল, ভক্তগণ শুনুন। 'অঠারো নলার কাছে প্রভু এলেন। 'আলম্বা দেবী'র কথা শুনে প্রণাম করলেন। ভাদ্রমাসের শুক্ল একাদশী তিথিতে সূর্য্য উদয় মাত্র 'ভুবনমঙ্গল নাম সংকীর্তন আরম্ভ করলেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রভু নিজের বহির্বাস কটিদেশে শক্ত করে বেঁধে ভূমি-দণ্ডবৎ আরম্ভ করলেন। দুর্লভ এ দৃশ্য। জগতে এমন লীলা, এমন মহাভাব পূর্ণ দণ্ডবত আর কখনও চোখে দেখা যায় নি। বিশ্বম্ভরের প্রণাম লীলা শুরু হল। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে যেখানে প্রলম্বিত হাত দুটি গিয়ে পৌঁছয় সেখান থেকে পুনরায় দণ্ডবৎ করতে করতে মহাপ্রভু চলেছেন। বেড়া কীর্তন নিয়ে 'হরে কৃষ্ণ' মহানাম উচ্চারণ করতে করতে মন্দির পরিক্রমা করে এসে মন্দিরে রইলেন চার দণ্ড কাল। 'হা-কৃষ্ণ' বলতে বলতে বিগলিত হয়ে পড়ছেন। দেহ প্রায় জ্ঞানশূন্য, ছলছল চোখ। মুক্তি-শিলাপতি সার্বভৌম অধিকারী কাতর মিনতি করে গৌরচন্দ্রকে তার ঘরে নিমন্ত্রণ করলেন। রাত্রে গঙ্গা মাতা মঠে প্রভুর চেতনা ফিরে এলো। সকল ভক্তগণ কে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখলেন। তাদের ভাব অনুভব করলেন। ভক্তগণের ভিতর নিত্যানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ, জগদানন্দ, কানাই ঘুন্টিয়া সবাই জ্ঞানী, সবাই অনুভবী। উৎকলীয় করণ, শিখি মহান্তি, পাঞ্জী লেখক, জীবদেব রাজগুরু, জ্ঞানবৃদ্ধ গোদাবর মিশ্র রাজগুরু আদি সবাই সেখানে ছিলেন। সবাই গোরার নাম প্রেম বিগ্রহ দর্শন করলেন। প্রতি ঘরে ঘরে পল্লীতে পল্লীতে সাড়া পড়ে গেল। ধন্য সন্ন্যাসী, ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করতে করতে মন্দির পরিক্রমা করলেন। ক্ষেত্রবাসী নরনারী এই কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনের জন্য তাদের মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কুঞ্জ মঠে এসে মহাপ্রভু বিশ্রাম নিলেন। প্রতিদিন নিত্য সার্বভৌম এখানে শাস্ত্র চর্চা করেন। প্রভুর মধ্যে ভাবের প্রকাশ হতে লাগল। ভাব মূর্ত্তিমান জ্ঞান এবং অহং কে বিনষ্ট করে দেয়। জ্ঞান এবং অহং বিনাশ করে প্রভু সার্বভৌমকে অপূর্ব ষড়ভূজ মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন।

শ্রীক্ষেত্রে প্রভুর নিত্য বেড়াকীর্তন, নগরকীর্তন শুরু করলেন। ক্ষেত্রের নরনারী তা দেখার জন্য পথ চেয়ে থাকে। সবার মন তাঁর কাছেই আবদ্ধ হয়ে রইল।

শ্রীকৃষ্ণ চরণে পূর্ণ মহাভাব সমর্পণ করে, প্রভু জগমোহন থেকে সন্ধ্যারতি দর্শন করেন। কার্ত্তিক মাসে, এখানে সর্বত্র ভাগবত লীলার অনুসরণ লক্ষ্য করে প্রভু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তাঁকে ঘিরে শিখি মহন্তি বেড়াকীর্তন পরিক্রমা শুরু করলেন। মন্দিরের দেবদেবী, কারুকার্য্য, স্থাপত্য সর্বত্র ভাগবত অনুসৃত। সর্বত্র কৃষ্ণ লীলার বর্ণন দেখে ভাবময় গোরা পুনরায় চমৎকৃত হ'য়ে গেলেন। সমগ্র মন্দিরে ভাগবতের প্রকাশ। বড়শৃংগার শয়নকালে রাধাপ্রেমের সঙ্গীত, 'গীতগোবিন্দ', 'মুদিত গোবিন্দ' পদাবলীর গায়ন শুনে প্রীত বিশ্বম্ভরের তটস্থভাব দেখা দিল। নারীরূপে ও নারী ভাব ধরে সেবকেরা সেবা করছেন। কুচ কুমকুমের লেপন, বক্ষআবরণ প্রভৃতি অঙ্গনা সুলভ হাবভাব। সেই ভাবের লক্ষণ দেখে নিত্যানন্দকে প্রভু বললেন—এ যে সম্পূর্ণ ভাগবতের লীলা নিত্য নীলাচলে আচরিত হচ্ছে। কার্ত্তিক শুক্ল একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই দিবস পঞ্চক রাসপঞ্চাধ্যায়ীর পাঠ হচ্ছে দেখে সদা ভাগবতে লীন প্রভু অত্যন্ত সুখী হলেন।

রবিবার কার্ত্তিক শুক্লদশমী। এই মন্দিরে একটি অঘটন ঘটল। মুখ্য শালায় প্রভু গোরা রায় মহাভাবে জগন্নাথ দর্শন করছিলেন। হঠাৎ প্রবল ইচ্ছা জাগল মনে, কাছে গিয়ে দর্শন করব। ভাবের আবেশে প্রভু সিংহাসনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। বলিষ্ঠ শরীর প্রতিহারী, অনন্ত

গচ্ছিকার, প্রভুর ভাবতনু ধরে যেতে নিষেধ করল। ভাবে উন্মত্ত প্রভু হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে অগ্রসর হলেন। প্রভুর সেই হস্তস্পর্শে অনন্ত প্রতিহারী ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল 'অনসরপিণ্ডি' পূজাপীঠে। মন্দিরে সকলে 'হায় হায়' করে উঠল। মত্তগজ প্রায় প্রভু বিশ্বম্ভর সিংহাসন থেকে চরণের প্রসাদ নিয়ে, প্রসন্ন মনে ফিরে এলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমগ্র শ্রীক্ষেত্রে এ সংবাদ প্রচার হয়ে গেল। অনন্ত প্রতিহারী বললেন, ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। শুধু তাই নয়, তিনি প্রভুর কাছে গিয়ে তুলসীর মালা, তিলক ধারণ করে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। রাজার কাছে কর্মচারীরা এই কথা প্রকাশ করল। ভক্তের এই মহিমা সকলে অন্তরে অনুভব করল। রাজা আজ্ঞা দিলেন, তাকে অভ্যর্থনা কর, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হও। সব সংবাদ আমাকে জানাও।

বৈশাখ মাস, শুক্ল পঞ্চমী তিথি। দেবদাসী নিয়োগের শ্রেষ্ঠী লাবণ্য প্রভুর আনুগত্য গ্রহণ করলেন! লাবণ্য জগন্নাথের নিত্য সেবা করে। দিবাবসানে গুরুড় স্তম্ভের পিছনে দাঁড়িয়ে মধুর স্বরে গান করে। সকলেই তাকে 'বৈষ্ণবী ভক্তি প্রধানা' বলে মান্য করে। সে দিন অক্ষয় তৃতীয়া, বহু লোক সমাগম হয়েছে। গরুড় স্তম্ভের কাছে খুব ভীড়। এত ভীড় যে নিশ্বাস পর্য্যন্ত নেওয়া যাচ্ছেনা। ভাবের আবেশে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছেন। এই সময় আরতির ধ্বনি উঠল আর সেই শব্দে সবাই যেন সচকিত হল। 'হরি হরি' জয় ধ্বনিতে কম্পিত হল মন্দিরভবন। সেই সময় অতি ব্যগ্রতায় দেবদাসী লাবণ্য এগিয়ে এলো। মানুষের ভীড়ে 'ইষ্ট' মুখ দর্শন করতে না পেরে, উৎকণ্ঠিতা দাসী মহাপ্রভুর পৃষ্ঠে উঠে জগন্নাথ দর্শন করতে লাগল। জগন্নাথ দর্শনে বিভোর লাবণ্যের কোন জ্ঞান নেই। বাহ্যজ্ঞান নেই কিন্তু কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে চন্দনচর্চিত নীল কলেবর পীতবসন জয়দেবের 'গীত গোবিন্দের' সুর। আরতি শেষ হ'য়েছে। লাবণ্যের চেতনা ফিরে এসেছে, প্রকৃত অবস্থা দেখে, প্রভুর পায়ে পড়ে আকুল চিত্তে সে কাঁদতে লাগল। 'প্রভু আমি মহা অপরাধী, আমায় ক্ষমা কর। পতিতকে উদ্ধার কর, আমায়

ত্রাণ কর। অজ্ঞানদাসীর অপরাধ মোচন কর।' প্রভু ভাবাবেগে বললেন, "ধন্য। কে তুমি রমণী? বাহ্যজ্ঞানশূন্য তুমি দাসী কুল শিরোমণি। সন্ন্যাসীর নারী অঙ্গ স্পর্শে অপরাধ বলে আমার যেটুকুও অহংকার ছিল আজ তাও গেল।" সেই দিন থেকে সেই দেবদাসী দূর থেকে মহাপ্রভুকে দর্শন করে এবং প্রত্যেক দিন প্রভু ফিরে গেলে তবে প্রসন্ন চিত্তে মন্দির থেকে ঘরে ফিরে যায়। প্রভু যেখানে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন করেন সেই খানকার 'পদরজ' তুলে মাথায় নিয়ে 'জয় জয় গৌরহরি' বলতে বলতে সে চলে যায়। দীক্ষা নেয়নি, তবু কণ্ঠে নিল তুলসীর মালা, কপালে দিল হরিমন্দির তিলক। সমগ্র দেবদাসীর জন্য এই নিয়ম নীতি স্থির ক'রে দিল। দেবদাসীরা মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ অনুগত হ'ল। রামানন্দ রায় লাবণ্যর এই চরিত্র মাধুরী শুনে তাকে গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠী বলে স্বীকৃতি দিলেন। এই ভাবে সমগ্র শ্রীক্ষেত্র 'গোরা ভাবে' ভাবিত হয়ে গেল। নিত্য সংকীর্তন লীলা বিস্তার হ'তে লাগল। মহাপ্রভুকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তগণ অশ্রু প্লাবিত নয়নে, নেচে গেয়ে বেড়া সংকীর্ত্তন করতে লাগলেন।

একদিন মন্দিরে প্রবেশ করার সময় (কল্পতরু) বটবৃক্ষের মূলে প্রভু হঠাৎ স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। ভাগবতের বাণী কর্ণে প্রবেশ করল। প্রভু স্বরূপ দামোদরকে বললেন, দেখ তো, কে ভাগবত পাঠ করছে? স্বরূপ বললেন, প্রভু, ইনি একজন উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ, শ্রীজগন্নাথের নিজজন, নাম জগন্নাথ দাস। অটইনাথ মন্দিরের পুরোন পাণ্ডা, ভাগবতী ভাবরসের সার কথা সুন্দর ক'রে বলেন। প্রভু বললেন, এই কল্পবৃক্ষের শাখাশ্রয়ে আমি বিশ্রাম করছি। তুমি ঐ ব্রাহ্মণের কাছে যাও। ওর কাছে কিছু গুপ্ত বিষয় জানতে হবে। ঐ ক্ষেত্র-দ্বিজপদ ভাগবতধ্যায়ীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা কর, 'ভাগবতে রাধা নাম নেই কেন?' ভক্তশ্রেষ্ঠ দামোদর তৎক্ষণাৎ প্রণাম ক'রে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবে এই গুপ্ত কথাটি জিজ্ঞাসা করলেন। প্রশ্ন শুনে বিপ্র জগন্নাথ একটু হাসলেন। প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। বললেন, উত্তম প্রশ্ন করলে, আমার হৃদয় কেঁপে উঠল। ভক্তিভরে জগন্নাথ দাস বদ্ধকর হলেন। কে তুমি! এ গুপ্ত প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে?

কৃষ্ণ সাধ্য, এ জীব নিরন্তর সাধক। সাধনাই আরাধিতা রাধা। প্রেম ও ভাবের সার। রাধা প্রেম ভাব সার। রাধা রমনীয়া রাসেশ্বরী। কৃষ্ণ-মন্ত্রের উপাস্য। সেই বিদ্যা সকল যুগের বন্দনীয়। 'কৃষ্ণ-বৃন্দারণ্যে' বিরাজ করেন। বৃন্দারণ্য আর কিছু নয়, হৃদয়ের অনাহত চক্র। তার ভিতরে দিব্য জ্যোতির্ময়ী রাধা বিরাজ করছেন। তিনি পরাৎপরা, তিনি পূর্ণতমা। পূর্ণচন্দ্রের মতো তার মুখমণ্ডল। ভক্তি আর মুক্তি, ভুক্তি আর মুক্তি। তিনি নিত্য, তিনি মূল প্রকৃতি স্বরূপিনী পরা। মূলপ্রকৃতি আর পুরুষের মধ্যে কোন তারতম্য নেই। কোন ভেদ নেই। একের অভাবে অন্যের কোন সত্তা থাকে না। 'রা' বর্ণের তাৎপর্য্য হ'ল, সতত যিনি দান করেন আর 'ধা' বর্ণের তাৎপর্য্য যিনি নির্বাণও প্রদান করেন। এই শব্দের উচ্চারণ মাত্রেই মুক্তি হয়ে যায়। তাই তিনি রাধা ব'লে কথিত হন। তার মধ্যে যে 'রেফ্' মাত্রা আছে তিনি নিশ্চলভক্তির স্বরূপ। তাঁর লক্ষ্য হল কৃষ্ণের চরণারবিন্দ। 'ধ' কার সহজাত্মিকা, তার তত্ত্ব হ'ল 'হরি' এই অক্ষয়দ্বয়। রাধা গুণাত্মিকা। কৃষ্ণ গুণবাচক বিগ্রহ। গুণাত্মিকার 'মহাভাব' প্রচ্ছন্ন থাকে। সেই ভাবের দৃশ্য পরিণতিই কৃষ্ণ। রাধা কৃষ্ণাত্মিক। নিত্য কৃষ্ণ রাধাত্মক। কৃষ্ণের প্রাণের প্রাণ রাধা। সে রাধা ভাগবতের প্রাণ। প্রাণ শরীরের মধ্যে পরম সত্তা। তবু শরীরই দৃশ্য, প্রাণ অদৃশ্য উহ্য। ভাগবতে তাই রাস রাসেশ্বরীর নাম তত্ত্ব উহ্য আছে। তাই শুকদেব গোস্বামী চরণের শ্রীমুখারবিন্দ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণ চরিতই প্রকটিত হয়েছে। যেমন, গোরা সাক্ষাৎ কৃষ্ণের বিগ্রহ কিন্তু রাধা ভাবান্বিত তেমনি কৃষ্ণ চরিত ভাগবতে প্রকট, রাধা—বিরহিত। প্রেমী এবং প্রেমাস্পদ জগতে অভেদ্য। কৃষ্ণলীলা মহাভাব, প্রেমের সঙ্গে জড়িত কিন্তু রাসেশ্বরীর গুহ্য প্রেম অপ্রকট, ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রেম অপ্রকট ভাব প্রকটিত। দক্ষিণ ভাব প্রকট, বাম ভাব লীলার স্বভাব। স্বভাবে মিশে থাকে। রাধা-নিধি, কৃষ্ণ চিন্তামণি। গুপ্ততম অনুভূতি অনুভবেই বোঝা যায়। যদি একবার 'ভাগবতে' রাধা নাম উল্লিখিত হ'ত তবে ভাগবতের নাম হ'ত 'রাধা লীলামৃত'। 'গীত গোবিন্দের উদ্ধৃতি ক'রে বলছেন—"হরিমেক রসম্ চিরমপি বিহিত বিলাসম্"—হরিই একমাত্র রস, ভক্তের চিরবিলাসের বস্তু। রসের আধার শ্রীরাধা, অপ্রকট অপ্রকাশ্য। প্রভু দূরে থেকে এই কথা শুনছিলেন। অদ্ভুত হুংকার ক'রে উঠলেন, আর

'হা কৃষ্ণ' বলে মূর্চ্ছিত হ'য়ে গেলেন। বললেন, কে তুমি ক্ষেত্রের ব্রাহ্মণ? মহাভাবের স্বরূপ ব'লে আমাকে শীতল ক'রে দিলে? সেই দিন থেকে, প্রতিদিন উভয়ের নিত্য-মিলন, নিত্য-আলিঙ্গন। সেই আলিঙ্গন ভাগবতের প্রতিপ্রীতি।

'ভাগবত প্রীতির' উপরে জগন্নাথ বিপ্র পুনরায় বলছেন, গোরা রায় শোন, জেনে রেখো শ্রীক্ষেত্রে রাধার পূজা নেই। রাধার হৃদয়গত ভাব, স্তম্ভস্বরূপে প্রতীয়মান রাধা অনাহত জ্যোতিঃ ও প্রীতির প্রমাণ। রাধা আহ্লাদিনীময়ী শক্তি, কৃষ্ণের থেকে পৃথক নয়। কৃষ্ণের প্রীতি জ্যোতিরূপ এখানে চক্রের ভাব বহন করছেন আর সেই চক্র আর কিছু নয় রাসমণ্ডলের প্রতীক স্বয়ং সুদর্শন। রাধাষ্টমীর দিন তার আরাধনা হয়। অশ্রু, কম্প, স্বেদ, রোমাঞ্চ অবস্থারপর শরীরে স্তম্ভাবস্থা প্রকট হয়। তাই জন্যে সুদর্শন এই মন্দিরে স্তম্ভস্বরূপে রয়েছেন। 'বিভাব' আর 'ভাবে'র প্রতীক এই চক্র যার মধ্যে দিয়ে রতিভাব হৃদয়ে প্রকট হয়। সেই রসসার আস্বাদন তত্ত্ব 'রাধাতত্ত্ব'। তাই জন্যে রাধাষ্টমীর দিন এই প্রেম-স্তম্ভের 'উৎসব যাত্রা' আচরিত হয়। 'বিভাব ব্যতিহি যেন যত্র বিভাবতে'র ন্যায় কৃষ্ণ বিভাব এ জগতে খ্যাত হয়। বিভাব নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু বিভেতি কখনও নষ্ট হয় না। রাধা আনন্দময়ী। সমস্ত আপদের বিনাশকারিণী। 'যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' বলে শ্রুতি প্রকাশ করেছেন। আনন্দ ময় ব্রহ্ম'ই বিদ্বানের লক্ষ্য। 'বিভেতি'র সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। তাই জন্য এই চক্র এখানে রাসমণ্ডলে'র প্রতীক রূপে নারায়ণের বামে বিরাজ করছেন। জগন্নাথের প্রেমময় শক্তি সুদর্শন রূপে প্রতিষ্ঠিত, আর সেই সুদর্শন রাধার প্রেমের স্বরূপ। তাই জন্যে রাধাষ্টমীতে তার তত্ত্ব চিন্তন হয়? এই রকম নানা আলোচনা প্রত্যালোচনার ভেতরে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদাস এক মন হ'য়ে গেলেন।

কিছু পার্ষদ এই ঘটনাকে সহ্য করতে পারলো না। উৎকল বাসী ব্রাহ্মণের প্রতি প্রভুর এই প্রীতি তাদের অসহনীয় হ'ল। চৈতন্য বললেন, ক্ষেত্রের এই ব্রাহ্মণ পরম ভাগবতী। জগন্নাথের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। রায় রামানন্দও তাঁর রাধাভাবের জন্য আমার অতি প্রিয়।

জগন্নাথ দাস ভাগবতী ক্ষেত্রের অলংকার স্বরূপ। আমার কাছে তার নিত্য দাস ভাব। সে আমাকে তার 'ইষ্ট' মনে করে। নিত্য কল্পবৃক্ষের নীচে ভাগবত পাঠ করে। তাকে তোমরা দণ্ডবৎ কর।

একদিন জগন্নাথদাস বদ্ধ-কৃতাঞ্জলি হ'য়ে নিবেদন করলেন এই শ্রীক্ষেত্রে তোমার একজন দাস আছেন। হরিবংশপুরে এই সন্ন্যাসী বাস করেন। তার নাম সৌরী গোস্বামী। তিনি গৌরী গোস্বামীর অনুজ। সেখানে আপনি আপনার প্রেমরস সম্ভার নিয়ে যান। ইনি গৌড়ীয় গোস্বামী। এই রসের নিত্য চর্চা করেন। প্রভু অত্যন্ত খুশি হলেন। তাঁর অনুজ গৌরী গোস্বামীর সঙ্গে প্রভুর অগ্রেই সাক্ষাৎ হয়েছিল। নদীয়া নিবাসী সৌরী গোস্বামী ধীর ব্যক্তি। ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের পিতা গজপতি পুরুষোত্তম দেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁকে দর্শন ক'রে প্রভু জানতে পারলেন ইনি প্রেমভাবের খনি। তুজনের সাক্ষাতে প্রেমভাবের উদয় হ'ল। প্রেম ভাবের যেন মণিকাঞ্চন যোগ হ'ল। প্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে সঙ্গে নিয়ে হরিবংশপুরে হেরাগোহিরী সাহিতে সাক্ষাৎ করলেন। রাজার প্রিয় সৌরী গোস্বামী অতি মিষ্ট ভাষী। শ্রীচৈতন্যকে দেখে সৌরীদাস প্রভুর মাতা পিতার প্রশংসা করলেন। প্রভু শ্রীজগন্নাথ প্রতিমার সামনেই বসলেন। প্রভুকে আন্‌মনা দেখে সৌরীদাস বললেন, সন্ন্যাস নিয়ে এসেছ, সব ছেড়ে দিয়েছ, তুমি তো ভুবনকে পাবন করার ব্রত নিয়েছ। এসো, আমার গুপ্ত কক্ষে কিছু বস্তু লুকিয়ে রেখেছি। তুমি দেখে আনন্দ পাবে এ আমার নিশ্চিত ধারণা। সৌরী গোস্বামী অন্ধকার একটি নিভৃত কক্ষে প্রভুকে নিয়ে গেলেন, আঁধারে আলো দেখার মত হঠাৎ শচীমার রূপদর্শন করালেন। মহাপ্রভু দেখলেন শচী মা গৃহে যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি রয়েছেন। নিমাইয়ের মুখ চুম্বন করলেন। বললেন, এ দৃশ্য নয়নে ধরছেনা। আনন্দে প্রভু সৌরী গোস্বামীর হাত ধরে নিত্যানন্দের কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন, কিভাবে কেন যে এই রূপের দর্শন করলাম আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। অদ্বৈত প্রভু বললেন, এ ভূমি সিদ্ধ ভূমি। যোগের সিদ্ধি

নয়, নামের সিদ্ধি। এখানে পূজিত ঠাকুরের একটি বিশেষ রূপ লক্ষ্য কর। জগন্নাথের সঙ্গে এখানে আহুল্যার পূজা হচ্ছে। 'আহুল্যা' অর্থ হল বৈঠা। প্রভু দেখলেন সেই তীর্থস্থানে 'মাতা গোসাইঙ্ক মঠে' সিংহাসনের উপর কাঠের 'আহুল্যা' পূজা পাচ্ছেন। কথিত আছে একবার গৌরীদাস পণ্ডিতের মান ভাঙ্গাবার জন্য শান্তিপুর থেকে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ নৌকা বেয়ে এসে ভবপারের উপায় স্বরূপ হরিনামের প্রতীক রূপে নিজের বৈঠাখানি দিয়ে যান। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সৌরীদাস গোস্বামীর কুটিরে পদার্পণ করলে তিনি ঐ বৈঠা প্রদানের কাহিনীটি স্মরণ করিয়ে দেন। বলেন, হে পাবনাবতার, আপনি একবার আমার ভাইকে দর্শন দিয়েছিলেন। স্মরণ থাকবে নদীয়া লীলায় গৌরী গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আপনি এই কাঠের আহুলা (বৈঠা) দিয়ে মহামন্ত্র প্রদান করেছিলেন। সেই থেকে আমাদের ইষ্ট দেবতা এই আহুলা। ভবসাগরে প্রাণকর্তা নৌকা স্বরূপ আপনি, আহুলা রূপ 'মহামন্ত্র' দানে মুক্তি বিধান করেন।

প্রভু কিছুদিন আহুলা মঠে একান্তে বাস করলেন। সার্বভৌম এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা কুঞ্জমঠের বাগিচায় অনুসন্ধান করলেন। কিন্তু সেই 'ত্রিমূর্ত্তি' কোথায় গেল? সবাই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। পরিশেষে আহুলা মঠে গিয়ে প্রভুদের দর্শন পেলেন। প্রভু বললেন, প্রতিবছর 'হেরা' পঞ্চমীর দিন এই মঠে তোমরা এসো। 'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্র স্বরূপ আহুলকে প্রণাম করে। গোস্বামীজীকে বললেন, আপনি আমার অগ্রজ, দণ্ডধারী। আপনি এখানে আছেন, অতএব এই স্থান আমাদের আদি স্থল। অদ্বৈত ঠাকুর এইখানে রইলেন। সীতা দেবীর নামে এই মঠ মাতা সীতা গোস্বামীর মঠ বলে খ্যাত হল। এইখানে চারমাস অবস্থান করে গোরা আবার কাশী মিশ্রের আলয়ে গমন করলেন। সেখানে ভাবপূর্ণ অষ্টকালীন লীলা আচরিত হ'ল।

চারমাস পর শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন প্রভু হঠাৎ উঠে পুরী গোস্বামীর পর্ণ কুটিরের দিকে চললেন। বাসলি সাহির বাগানে পুরীর আশ্রম।

অন্যান্য বৈষ্ণবদের সঙ্গে নিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু আর শ্রীগৌরাঙ্গ দুজনে সেখানে উপস্থিত হলেন। পরমানন্দ পুরী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মহাপ্রভুকে 'দিব্যাসন' দিলেন বসতে। নামকীর্ত্তনে প্রায় চারি দণ্ডকাল কেটে গেল। একটি প্রহর গত হ'ল। প্রভু হঠাৎ বললেন আমার তেষ্টা পেয়েছে। আমি তৃষ্ণার্ত। জলের জন্য সেবক মাধবকে দূরে পাঠানো হ'ল। প্রভু বললেন, আর দেরী করো না। শীঘ্র আমাকে জল দাও। শুনে পুরীবাবা অত্যন্ত কাতর হলেন। বললেন, প্রভু, আমার মঠে যে কূপ আছে সেটি নূতন। খুব 'খারি', লোনা জল। তাই আমি দূর থেকে জল আনার জন্য সেবককে পাঠিয়েছি। প্রভু উঠে গেলেন সেই কূপের ধারে। কূপের মধ্যে ভালো করে দেখলেন। তিনবার পরিক্রমা করলেন। বললেন, মা শ্বেতগঙ্গা ভগবতী, এ বৈষ্ণব আশ্রমে এসো। দণ্ড প্রণাম করে গঙ্গা গঙ্গা নামকীর্ত্তন করতে লাগলেন। বিশ্বম্ভর বললেন, আমি অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর, আমি এই জলই পান করবো। গোবিন্দদাস ঐ কূয়া থেকেই জল তুলে দিলেন। প্রভু মহানন্দে ঐ জল পান করতে লাগলেন। বাসলি সাহির সর্বপ্রধান ব্যক্তি বিশ্বনাথ প্রতিহারী মহাপাত্র উপস্থিত ছিলেন। এই অদ্ভুত কৃত্য দেখে মুগ্ধ হলেন। গঙ্গাজল তুল্য এই জল। সকল বৈষ্ণবগণ এই জল সেবা করলেন। লবণাক্ত জল নামের প্রভাবে গঙ্গা জল হয়ে গেল। রাজার কাছে কর্মচারীরা এই সংবাদ দিলেন। রাজা পুরী গোস্বামীর মঠ দর্শন করতে এলেন। পুরস্কার স্বরূপ পাঁচ বিঘা জমি বাড়ী দান করলেন। ক্ষেত্রের অধিবাসীরা ঐ নবগঙ্গার জল পান করতে লাগলেন। চৈতন্য মহিমা বিস্তার লাভ করল।

এই সময় মন্দিরের মুখ্য পাঞ্জী লেখক মহাপ্রভুর কাছে উপস্থিত হ'য়ে প্রার্থনা করলেন, রঘুনাথ দাস তাকে কণ্ঠী দীক্ষা দেবেন। করণ বললেন, প্রভু এই ক্ষেত্রের অপূর্ব মাহাত্ম্য। কবি ডিণ্ডিম, জীবদেব, গ্রহরাজ, রাজগুরু, গোদাবর রাজগুরু বিস্তারিত ভাবে অবগত আছেন। এঁরা কীর্তনের পথ ও মতকে শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর ভাবকে গুরুত্ব দেন।

রামানন্দ পট্টনায়ক একজন মহৎ ব্যক্তি। নিত্য কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর। তিনি গরিয়ান। গোদাবরী মণ্ডলের মহামাণ্ডলিক। ভবানন্দ

করণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। 'গীতগোবিন্দ' গানের উত্তম রসজ্ঞ। গোপীনাথ বড়জনা একজন বিষয়াধিপতি। রাজা পারিতোষিক দিয়ে এঁকে শ্রেষ্ঠী পদ দিয়েছেন। কৃষ্ণরসের নিত্যরসজ্ঞ রামানন্দের পরিচালনায় পালঙ্ক পুখারী পুষ্করিণীর তটে 'ভক্তিবৈভব' নাটকটি একবার অভিনীত হল। রামানন্দের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীক্ষেত্রের সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য সবাই তাঁকে ভালবাসেন। তিনি সবাইকে নিয়ে ভক্তিরসের গান করেন। সে রস অতি শুদ্ধ। রামানন্দের কথা সার্বভৌম গোস্বামী পূর্বে উল্লেখ করেছেন। নির্দ্দেশ দিয়ে দক্ষিণ দেশে পাঠিয়ে ছিলেন।

চিলিকা হ্রদের পথ দিয়ে কীর্তন মণ্ডলী নিয়ে আশিকা নগরে এসে ঋষিকুল্যা নদীতটে বিশ্রাম করলেন। শ্রীকূর্ম নাগাবলীর পথ দিয়ে, সংকীর্তনে সকলকে পবিত্র করে 'কভুর' মণ্ডলে রায় রামানন্দ কে দেখলেন। দুজনের মিলন হ'ল সংকীর্তন দল ভাবে বিভোর। রামানন্দ বলছেন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহু প্রজন্য ভয় ভঞ্জন'। এই কীর্তন শুনে প্রভু পুলকিত। ভাবাবেশে রামানন্দ প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়লেন। প্রভু প্রেমের আবেশে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তুমি কি সাধন করছ ? রায় বললেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' গান এই আমার সাধন। 'আর কিছু নাই সবকিছু একমাত্র কৃষ্ণেরই' এই বলেই শুধু প্রণাম করছি। কৃষ্ণ বিনা আমার অন্য গতি নাই। কৃষ্ণনাম আমার সর্বস্ব। যুগলরসের রাধা-ভাব আমার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। প্রভুর শরীর রোমাঞ্চিত হল। 'দৃঢ়াভক্তি'র এই উক্তি শুনে রামানন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, জগন্নাথ ধাম নিত্য লীলা স্থল। পূর্ণ ভাগবত ভূমি। আমি এখানে থাকবো। হে সুধীশ্রেষ্ঠ, তুমিও সেখানে চলে এসো। আমি পুরুষোত্তমে বলিষ্ঠ লীলা প্রকাশ করবো।

এই কথা ব্যক্ত করে প্রভু দক্ষিণ দেশে গেলেন। বুঢ়ালেঙ্কা নামে একজন কর্মচারীকে রামানন্দ পুরী পাঠালেন। ক্ষেত্রের এই চরিত কথা লোকমুখে প্রচারিত হয়ে গেল। বুঢ়ালেঙ্কা রাজার কাছে গিয়ে বললেন, চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে ছিলেন, কিন্তু আমরা কেউ তাঁকে চিনতে পারিনি। পাবন নাম প্রচারে ইনি পতিতপাবন। হে রাজন, তাঁর কাছেই মন আবদ্ধ রাখুন।

একবছর আটমাস অতিবাহিত হল। আবার বিজ্ঞানগরে মহাপ্রভু এসে নামের প্রচার করলেন। পথে কীর্তনের মধ্যে রাজার দূত সাক্ষাৎ করে বললেন, প্রভু, শীঘ্র ক্ষেত্রে চলুন। প্রভু উৎকণ্ঠিত হয়ে বনাকীর্ণ দুর্গম ব্রহ্মগিরির পথ দিয়ে পুরুষোত্তম শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। পথে 'আলালনাথ'কে দর্শন করলেন। প্রণাম করে বললেন, 'যিনি কৃষ্ণ তিনি নারায়ণ' এতে কোন ভেদ নেই। শুনে গৌড়ীয় ভক্তগণ এগিয়ে এলেন। স্বরূপ দামোদরের মন পুলকিত হল। কাশী মিশ্রের নিবাস স্থানে যে উদ্যান ছিল সখানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নির্মাণ করা হল। সুন্দর একটি গুপ্ত কক্ষ নির্মিত হল। প্রভু তাই দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়ে বৈষ্ণবদের নিয়ে উৎসব করলেন। সেই উদ্যান পার্শ্বে হরিদাস একটি কুটির রচনা করলেন। ঐখানেই বক্রেশ্বর পণ্ডিত স্বতন্ত্রভাবে বাস করতে লাগলেন। বিদ্বান শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ গোদাবর রাজগুরু এই ব্যতিক্রম দেখে দুঃখিত হলেন। ভক্তি ভাগবত কৃষ্ণ লীলামৃতের পরিপ্রচার দেখে বুঝলেন স্মার্ত্তভাব মলিন হয়ে গেছে। রাজাজ্ঞা নিয়ে ইনি ক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলেন। 'সারিয়া' নদীর তট দেশে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে তুমরায় পুট্ট নামে এক শাসন স্থাপন করলেন। সব বৃদ্ধ স্থবিরদের চলে যাবার পর রায় রামানন্দ পুরীতে এসে চৈতন্য লীলা দেখে অত্যন্ত সুখী হলেন। মহাপ্রভু রামানন্দের আবাসে এসে মিলিত হলেন।

প্রতাপরুদ্রের ভাব ভক্তি লক্ষণ দেখে প্রভু খুশী হলেন। একদিন গোপীনাথ পাটপাত্র অনুরোধ করলেন আপনি রাজাকে রাজপ্রাসাদে দর্শন দিন। মহাপ্রভু বললেন, বিষয়ী রাজার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? তিনি জগন্নাথের সেবক এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি জানি তোমার রাজা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়। এই কথা শুনে রাজা, মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আরও ব্যাকুল হলেন। রায় রামানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। রায় রামানন্দ বললেন, আমি নিশ্চিত রূপে দর্শন করাবো। কিন্তু আমাদের ছদ্মবেশে যেতে হবে। শুক্লবস্ত্র শুক্ল উত্তরীয় পরিধান করে

রাজা আর রায় রামানন্দ মন্দিরে গেলেন। গোপনে জগমোহনে অপেক্ষা করলেন। এই উপস্থিতি কেউ জানতে পারলেন না। এই সময় বেড়া-সংকীর্তন শেষ ক'রে প্রভু ভাবাবেশে যে রূপ প্রকাশ করলেন তার বর্ণনা করতে আমি অক্ষম। উদ্দণ্ডভুজ বিস্তার ক'রে নয়ন অশ্রুতে পরিপূর্ণ, মুখে 'হরেকৃষ্ণ' নাম, নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে কীর্তন করছিলেন। নিত্যানন্দ বয়সে জ্যেষ্ঠ, গম্ভীর, শুক্লশরীর, করে শিঙা ধারণ করেছেন। তিনবার পরিক্রমা ক'রে যখন মন্দিরে প্রবেশ করলেন তখন রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর প্রতি নির্দ্দেশ করে সংকেত দিলেন। সেদিন জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দশমী। সেই দর্শনে নামরূপের অপূর্ব বিভব ছিল। রামানন্দ বললেন, হে মহারাজ আপনি জগন্নাথ পরায়ণকে দর্শন করুন। বিশ্বম্ভর, সাক্ষাৎ নামের অবতার। রাজা দেখলেন, তাঁর মধ্যে বিচিত্র রূপের সমাহার। গৈরিক বসনে আবৃত হরে কৃষ্ণ রাম এই তিন তত্ত্বের লক্ষণ তার শরীরে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, নানা অলংকার শোভিত কমনীয় মুখাম্বুজ। দণ্ড কমণ্ডলু ধারী সন্ন্যাসবপু। তদূর্দ্ধে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ বংশীঅধর। তদূর্দ্ধে ধনুর্বাণধারী রাম বিরাজিত। চরণ থেকে শিরাবধি হরে কৃষ্ণ রাম এই 'ত্রিমূর্ত্তি' প্রকটিত। শরণাগতির আশ্রয়—গৌরসুন্দর, তোমাকে প্রণাম। এই ভাবে দু'জনে প্রণাম করার পর পুনঃ প্রভু দ্বিভুজ সন্ন্যাসীরূপে দেখা দিলেন। তাঁরা ষড়ভুজ যন্ত্রের সঙ্গে ত্রি নাম, ষোড়শনামের পরিকল্পনায় জগমোহনের ষোড়শ স্তম্ভে উৎকীর্ণ করলেন।
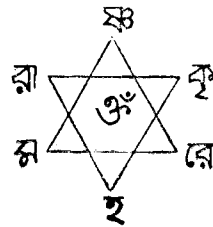
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেখানে ষড়ভুজ মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হয়েছিলেন সেখানে সকলেই তাঁকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার বলে গ্রহণ করেছিল। পট্টজ্যোতি মহাপাত্রকে ডেকে রাজা বললেন, এইখানে আমি যে অদ্ভুত শক্তি দর্শন করলাম—যখন মন্দিরের কাজ শেষ হবে এই স্তম্ভে ঐ ষড়ভুজ মূর্ত্তি স্থাপন করতে হবে। মাঝে মহাপ্রভু, দক্ষিণে নিত্যানন্দ, বামে সেবকের মত থাকবো আমি। আমার রাজদণ্ড, ছত্র আদি সব প্রতীক থাকবে। এই মূর্ত্তির দ্বারা জগতে নামের ও নাম তত্ত্বের প্রচার হবে। রাজা বললেন, রায় রামানন্দ আর প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রয়োজন নেই। তাঁকে জগন্নাথের পট্টবস্ত্র প্রদান কর'। রাজা রাজপুরে গিয়ে সবাইকে এই অপূর্ব দর্শনের কথা বিস্তারিত ভাবে বললেন। বললেন ইনি আমার পিতা মাতা ইনি আমার গুরু। কাশী মিশ্র যে মহান রাজগুরু এতে কোন সংশয় নেই। সিংহাসনের প্রত্যক্ষসেবা তার জন্য প্রয়োজন নেই। আমি পূর্বেই ঘোষণা করেছি যে মন্দিরে কেবল 'গীত গোবিন্দ' পাঠ হবে। সে আজ্ঞা তো পরিবর্ত্তন করা যাবেনা। কিন্তু গম্ভীরা অধীশ্বরের আজ্ঞা না নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে কেহ কীর্তন করতে পারবেনা। অন্য সেবার জন্য এই পরিষদ যেন আমাকে অনুরোধ না করে। কারণ তা করলে আমার নীতি ভঙ্গ হবে। এক বৎসর পর্য্যন্ত মহাপ্রভু গম্ভীরাতে থেকে আষাঢ় অমাবস্যায় পুনরায় মন্দিরে এলেন। রাজা রথীপুর রাজবাটী ত্যাগ ক'রে স্থায়ীভাবে পুরীতে বাস করতে লাগলেন। প্রভুর চরণে সব কিছু সমর্পণ ক'রে 'চৈতন্য ঠাকুর আমার সম্পদ' বলে ঘোষণা করলেন।

পূর্ণিমার দিন, প্রভু জগন্নাথ দর্শন করতে এলেন। সিংহদ্বারে ছাতা মঠের কাছে বৈষ্ণবসেবা করলেন। অষ্টকালীন সংকীর্তনে প্রভু পুলকিত। মন্দিরের প্রধান সঞ্চালক 'পরিচ্ছা' স্নানের পদোদক এনে সমর্পণ করলেন। সন্ধ্যার সময় প্রভু গম্ভীরায় ফিরে গেলেন। মধ্যরাত্রে পুনরায় জগন্নাথ দর্শন করবার জন্য এসে দেখলেন বিগ্রহ নেই। বিষাদগ্রস্ত প্রভু, নিত্য নিয়ম সেবার অনুসরণে অলালনাথের মন্দিরে গমন করলেন। পনেরো দিন অলালনাথের মন্দিরে বিরহ ব্যথায় একাসনে পড়ে রইলেন। বৈষ্ণবরা নাম করতে লাগলেন। সেই পঞ্চদশ দিবস

বিরহ ভাবে প্রভু তিলক সেবা করলেন না। মালাও গ্রহণ করলেন না। কৃষ্ণ বিরহে কৃষ্ণ চিন্তায় মৌন হ'য়ে রইলেন। এই ভাবে দ্বাদশ বৎসর এক ভাবে বিরহ শয্যায় থাকতে থাকতে কঠিন পাষাণও ভাবে বিগলিত হ'য়ে গেল। পাষাণ বিগলিত হ'ল। কি ভাবে? পাথরের ওপর তাঁর সমস্ত শরীরের দাগ পড়ে গেল। প্রভুর বিরহ ব্যথার প্রতীক রূপে আজও ঐ ক্ষতচিহ্ন বিরাজিত। মহাপ্রভুর শরীর পঞ্চভূতাত্মিক শরীর নয়। যদি তাই হত এই লীলা প্রত্যক্ষ নয়নে কি ক'রে দেখলাম। চতুর্দশী নিশাকালে পুনঃ পুরীতে এসে বেড়া সংকীর্তন ক'রে প্রভু গম্ভীরায় প্রবেশ করলেন। পুনঃ নাম সংকীর্তনের ধ্বনিতে মুখরিত হল নগর।

উভা (আষাঢ়) অমাবস্যার দিন। রাজকর্মচারীরা, শিখি মহান্তি, কানাই ঘুন্টিয়া, সিংহারী, নিরঞ্জন মহাপাত্র, পুষ্পালক কর, বটেশ্বর সাঁই দয়িতা সকলে প্রভুকে সসম্মানে, গম্ভীরা থেকে নিয়ে এসে দর্শন করালেন। চতুর্দিক কম্পিত করে প্রভু ভ্রমণ করতে লাগলেন। জগন্নাথ কে আলিঙ্গন করে কোল করবার সময়ে হাতের (জাপ) করপল্লব আট্‌কে গেল। প্রভু অচৈতন্য হয়ে গেলেন। দৈতরা হাতের বাঁধন খুলে তাঁকে নিয়ে এলেন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে আট বছর প্রভু দর্শন করছিলেন। দৈতসেবকরা জগন্নাথের প্রিয়জন। তারা জগন্নাথ শ্রীবিগ্রহ থেকে পট্টডোর নিয়ে প্রভুকে সাজিয়ে দিলেন।

কৃষ্ণ চিন্তায় উন্মত্ত মহাপ্রভু দেখলেন যে ঝাড়ু মঠের সাধুগণ মন্দির মার্জ্জনা করছেন। তিনি গম্ভীরায় ফিরে গিয়ে বললেন, চল আমরা সবাই যাব। জগন্নাথ যে জনকপুরে প্রথম প্রকট হয়েছিলেন, সে স্থান মহারাসের স্থান, সেই গুণ্ডিচা আমরা স্বহস্তে মার্জ্জনা করবো। নিত্যানন্দকে ডেকে বললেন, গৌড়ীয় উৎকলীয় সবাই এক সঙ্গে চল। গুণ্ডিচা মার্জ্জনা করবো। গুণ্ডিচা বাড়ী মন্দিরে দুটি কূপ ছিল। তাকে শোধন করে, চার দিকে পরিষ্কার করে, চূণের ছিটা দিয়ে মার্জ্জনা করতে লাগলেন। প্রভু স্বয়ং হাতে চন্দন কর্পূর জল নিয়ে মহাবেদী বিধৌত করলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে মন্দিরে পতাকা উত্তোলন করে মার্জনা কর্ম সমাপন করলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান করে, নৃসিংহ

বল্লভ উদ্যানে কানাই ঘুন্টিয়া প্রদত্ত দধিচূড়া প্রসাদ পেয়ে স্বস্তি অনুভব করলেন। নরসিংহ দর্শন করে প্রভু ফিরে গেছেন। সংকীর্তন করলেন, "কাল আমার প্রাণনাথ প্রভু এইখানে আসবেন।" পথে নানা লীলা-কেলি করে, নিজ নিজ ইষ্ট মন্ত্র স্মরণ করতে করতে আপন আপন স্থানে গমন করলেন। পার্ষদবর্গকে সঙ্গে নিয়ে, শ্রীমন্দিরে বেড়া সংকীর্তন করে মন্দিরে প্রধান পরিচালকের কাছ থেকে প্রসাদ পেয়ে, জগন্নাথের নবযৌবন বেশ দর্শন করলেন। নটবর প্রভুর নিত্য নব নব রূপ। রাজকর্মচারীরা, রাজ আজ্ঞা অনুসারে মন্দিরের পাশে একটি ছোট ঘর মহাপ্রভুকে সমর্পণ করলেন। প্রভু সানন্দচিত্তে সেখানে বিশ্রাম করলেন। দেখলেন, সম্মুখে 'তোপমণ্ডপ' মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব লীলা চিত্র। সেই ছোট মন্দিরে সংকীর্তন ক'রে ভক্তগণ জগন্নাথ দর্শন করবেন এই উদ্দেশ্যে সেই দান প্রভু স্বীকার করলেন। ন'টি বছর প্রভু রথযাত্রার সময় এইখানে বসে জগন্নাথ রথের ওপর আনবার পদ্ধতি 'হুপণ্ডি' দর্শন করেন। দ্বিতীয়া তিথির প্রাতে, সপার্ষদ কীর্তন নিয়ে দর্শন করবার সময় সুবর্ণ ব্রহ্মচারী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর গলায় জগন্নাথের পট্টডোর বেঁধে দিলেন। প্রভু দামোদর লীলাকীর্তন করতে করতে অচেতন হয়ে গেলেন। পহুণ্ডির তালে তালে নেচে প্রভু জগন্নাথের সঙ্গে যাত্রা করলেন। ডোর মালা অঙ্গে, মহাপ্রভুর রূপ অপূর্ব্ব সুন্দর হয়ে উঠল। সিংহদ্বারে জগন্নাথকে দর্শন করবার সময় অচল ব্রহ্ম আর সচল শ্রীমূর্তি এক হ'য়ে গেল। উদ্দণ্ড কীর্তন করলেন। সাধারণ এক প্রহরীকে ধরে প্রভু বলছেন —তুহুঁ গোপী আমি গোপীনাথ। এ সময় রাজা প্রতাপ রুদ্র মার্জনী হস্তে বড় ছাতা মঠ থেকে পথ পরিষ্কার করছিলেন। তার ভাব দেখে প্রভু বললেন, এ রাজা নয়, এ কৃষ্ণ পার্ষদ কিশোরী। তার মার্জনী হস্তে সেবা দেখে বললেন আর কোথাও এ ব্যবস্থা নেই। কেবল নীলাচলে আছে।

চতুর্দশ দ্বিপঞ্চাশত (১৪৫২) শকাব্দে এক বিষম পরিস্থিতি দেখা গেল। গৌরাঙ্গ সুন্দর নৃত্যগীতে আকাশ বাতাস কম্পিত ক'রে চারটি সম্প্রদায় নিয়ে চলেছেন। খোল করতাল নামের অপূর্ব ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বলরামের তালধ্বজ রথ চলে গেল। ভক্তরা রথের রশি ধরে আকুল ভাবে

টানতে লাগলেন। তার পিছনে গেলেন সুভদ্রা। কিন্তু জগন্নাথের রথ আর চলে না। ভক্তেরা দৃঢ় ভাবে দড়ি টানতে লাগলো। ধ্বজাধারী নির্দেশক চিৎকার করতে লাগল। রথ চলল না। জয় জয় শব্দে আকাশ প্রকম্পিত হ'ল। নানাবিধ উপায় অবলম্বনেও রথ চলে না। সবাই উদাস হয়ে বিপদের আশঙ্কা করতে লাগল। রাজা রথাগ্রে সাষ্টাঙ্গ ভূলুণ্ঠিত হয়ে বললেন, প্রভু বনমালী, তুমি কৃপা করে চল। তিন দণ্ড কাল কেটে গেল। রাজা যুবরাজকে আদেশ করলেন, হস্তিশাল থেকে চারটি হাতি নিয়ে এসো। মাথা দিয়ে হাতিরা রথকে ঠেলবে। শীঘ্র কর। তৎক্ষণাৎ মাহুতেরা চারটি হাতি নিয়ে এসে রথ চালাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু হল না। হা হা করে পড়ে গেল। সংকীর্তনের মাঝ থেকে হুংকার করে গোরা রায় বেগে ছুটে এসে হাতির ভিতরে দিয়ে গিয়ে রথকে ঠেলতে লাগলেন মাথা দিয়ে। রথ চলতে আরম্ভ করল। জয় গোরা, জয় জগন্নাথ শব্দে পৃথিবী কেঁপে উঠল। রাজা এসে প্রণাম ক'রে বললেন আমাকে দূরে পৃথক করে রাখছেন কেন ? আপনি তো সাধারণ মানুষ নন, সাক্ষাৎ ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, তুমি রাজা নয়। তুমি জগন্নাথের প্রিয়তম দাস। আজ তোমাকে আমার পার্ষদের মধ্যে গ্রহণ করলাম। নাম প্রেম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব তোমার ওপর দিলাম। এই ভাবে দশ বছর মহাপ্রভু রথযাত্রার লীলা করলেন।

গুণ্ডিচা যাত্রায় উল্টোরথে হেরা পঞ্চমীতে এই কীর্ত্তন লীলা চলে। রথযাত্রার পর রায় রামানন্দ জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে 'ভক্তি-বৈভব' নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করলেন। সেই অভিনয়ে অভিনেতা ছিলেন বৈষ্ণবগণ। গজপতি বড়জনা, কাশীমিশ্র সম্মুখে বসে নাটক দেখে রায় রামানন্দকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। প্রতাপরুদ্র প্রভুর কাছে বসে নব নব ভাব প্রকাশের অপূর্ব দৃশ্য দেখে আনন্দিত হলেন। রায় রামানন্দ, দেবদাসীরা, শিখিমহান্তী, কানাই ঘুন্টিয়া, মান প্রতিহারীর অভিনয় প্রশংসিত হ'ল। নাটকের মাঝে 'জয় কৃষ্ণ' 'জয় রাধা' হরি ধ্বনি হচ্ছিল। এই স্থান গুপ্ত বৃন্দাবন রূপে খ্যাত হ'ল। লীলা অভিনয় শেষ হল।

যেখানে জগন্নাথের ভোগ হয় সেই স্থানে রাজার হাত ধরে রস বিচার করতে বসলেন। ভক্তি তত্ত্বের মধ্যে রাজা নামতত্ব সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। প্রভু বললেন, ধন ধান্য রাজ্য এ সব ইহলোকের বদ্ধজীবের সার সাধন। কিন্তু মোক্ষকামী জীবের জন্য এ সব আসক্তির কারণ। তুমি কৃষ্ণের সঙ্গে সখ্য স্থাপন কর। নামের সঙ্গে অখণ্ড প্রীতি জাগ্রত কর। যুবরাজের হাতে রাজ্য দিয়ে, নামের প্রচার কর। তোমার জন্ম বিষ্ণু অংশে। তুমি শ্রেয় পন্থা অবলম্বন কর। নাম বিনা কলিযুগে আর গতি নেই। জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া সব নামের কাছে নিরর্থক। নাম একমাত্র গতি। পথ হ'ল ভক্তি। আর লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ। এই তিন কথা জান। অন্য সব অকারণ। এই কথা ব'লে প্রভু নিজের গলার মালা রাজাকে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, কৃষ্ণে মতি হোক। জগন্নাথ দর্শনের পর প্রভু গম্ভীরাতে গিয়ে বিশ্রাম করলেন। এভাবে সংকীর্তন লীলা চলতে লাগল।

এই সময়ে দক্ষিণ ভারত থেকে সংবাদ এলো বিদ্যানগরে বিপ্লব হয়েছে। সুহৃদ রাজারা দণ্ডপাট শাসন মানছেন না। রাজা যুবরাজকে ডেকে বললেন, তুমি বিদ্রোহীকে আয়ত্ব কর। ১৪৩৮ শকাব্দে (১৫১৬ খৃঃ) যুবরাজ বীরভদ্রদেব অশ্ব ও পদাতিক সেনা নিয়ে বিদ্যানগরে আত্মীয় শত্রু কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। এদিকে বীর চূড়ামণি রাজা সার্বভৌমের মুখ থেকে ভাগবত শ্রবণ করে কৃষ্ণরসে তৃপ্ত হলেন। বালিসাহি নগরে কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। কাশী মিশ্র কনক দুর্গার পূজা করলেন। আঠারো দিন পর দক্ষিণ দেশ থেকে সংবাদ এলো বীরভদ্রদেব মারা গেছেন। রাজা মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন। ঐ রাতেই পুরী ছেড়ে কটক চলে গেলেন। মস্তকে হাত রেখে প্রতিহারী এই সংবাদ চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে বললেন। সবাই দুঃখ প্রকাশ করলেন। মহাপ্রভু বললেন, আমি গৌড়দেশে যাব। সাতদিন পর পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে প্রভু কটক পথে যাত্রা করলেন। কটক যাবার পথে রায় রামানন্দ, কানাই খুন্টিয়া, শিখি মহান্তী প্রভুর সঙ্গে চললেন। কটকে তিন দিন অবস্থান

করে রাজাকে বহুপ্রকার সান্ত্বনা দিলেন। রাজা বললেন আপনি চলে যাবেন না। প্রভু শপথ করে বললেন, জগন্নাথ আমার প্রাণপতি, নন্দাত্মজ, তাঁকে ছেড়ে গৌরাঙ্গের অন্যগতি নাই। আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসবো। যে সব দুর্ঘটনা ঘটে গেল এ সব তাঁরই ইচ্ছা। আরও বললেন, বিদ্বেষে অবশ্যই জনক্ষয় হয়। নিরন্তর কৃষ্ণ সেবা কর। সাধুজনের সেই হল গতি। 'গড়গড়েশ্বর শিব' দর্শন করে বৈষ্ণবদের বললেন তোমরা ফিরে যাও। কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন বৈষ্ণবরা। শীঘ্র ফিরব এই কথা বলে প্রভু মৌন হ'য়ে গেলেন।

স্বরূপ দামোদর আদি প্রভুর সঙ্গে যাত্রা করলেন। ক্ষীরচোরা গাপীনাথ দর্শন করে রায় রামানন্দ প্রভৃতি শ্রীক্ষেত্রে ফিরে এলেন। পুরীতে ভাগবতী বৈষ্ণব জগন্নাথ দাসের সঙ্গে নামের প্রচার করতে লাগলেন। পুরীতে নিত্য বেড়াসংকীর্তন চলল। হরিদাসের কাছে একত্র হয়ে সকলে কীর্তন করতে আরম্ভ করলেন। হরে কৃষ্ণ নাম প্রচার হতে লাগল। শুধু উৎসব, হরিগোষ্ঠী, জন্মাষ্টমী, নাম-কীর্ত্তন, লীলা গায়ন আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগুণের প্রচার। মহাপ্রভু পুরীতে যে যে স্থানে যে যে সময় যে যে লীলা উৎসব ক'রে ছিলেন, বৈষ্ণবগণ অনুরূপ লীলা আচরণ করতে লাগলেন। জগন্নাথ দাস ভাগবত পুরাণ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য মহাপ্রভুর নাম-প্রশস্তি করতে লাগলেন। টোটা গোপীনাথে গদাধর গোস্বামীর কাছে নাম উৎসব চলতে লাগল। জগন্নাথ বল্লভে প্রচার চলল রায় রামানন্দ গীতাবলি পাঠ মাধ্যমে। দিবারাত্র কেবল সৎসঙ্গ এবং নামপ্রচার। আট মাস অতিবাহিত হল। স্বরূপাদি ভক্তগণ সঙ্গে নিয়ে গৌর ফিরে এলেন নীলাচলে। ধর্ম, কর্ম, আচরণ সবের মধ্যে রাজার নাম-প্রীতির প্রকাশ দেখা গেল। রাজা আত্মতৃপ্তি অনুভব করে জামাতা কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে সন্ধি করলেন। কন্যা অন্নপূর্ণাকে জামাতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। প্রভু অনেক উপদেশ দিলেন।

বড়জেনা গোপীনাথ কাঁন্দি রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলেন। গোপীনাথ বহু বিত্ত অর্থ আত্মসাৎ করেছেন ব'লে রাজা তাকে দণ্ড

দিলেন। কটকে গোপীনাথের বন্দী হওয়ার সংবাদে রায় রামানন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। কিন্তু প্রভুকে কিছু বললেন না। একদিন গম্ভীরাতে শঙ্কর প্রভুর কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করলেন। রায় রামানন্দও দুঃখ প্রকাশ করলেন। প্রভু বললেন, তুমি একজন কর্মচারী পাঠাও। রাজাকে বল সে ক্ষমা করবে। করণ প্রভুর আদেশ নিয়ে কটকে গেল। প্রভুর সংবাদ রাজাকে দিল। রাজা বললেন, গণ-অর্থ যে চুরি করে তার মস্তক ছেদন করা উচিৎ। যদি সে সমস্ত অর্থবিত্ত দাখিল করে তাহ'লে প্রভুর আজ্ঞায় তাকে ক্ষমা করতে পারি। সেই আদেশে তার সমস্ত জমি বৃত্তি বাজেয়াপ্ত হ'য়ে গেল। বিষয় পদ কেড়ে নেওয়া হ'ল। তারপর ক্ষমা করা হ'ল। গোপীনাথ এসে শ্রীক্ষেত্রে প্রভুর শরণাগত হল। কিন্তু না রাজা, না প্রভু, না রায় রামানন্দ, কেউই তার মুখ দর্শন করলেন না। এই ঘটনায় রাজার কিছুটা অপযশ হল। কিন্তু নিত্যলীলায় সদামগ্ন প্রভু সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

বৈশাখ, শুক্লপক্ষ তৃতীয়া তিথি। প্রভু মন্দিরে প্রবেশ ক'রে বেড়াকীর্ত্তন করে 'বাড়া' নামক স্থানে দেখলেন মোহান্তদের সভা বসেছে। দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, যোগী, আচারী, বাউল, রামানন্দী, নিম্বার্কবাদী সব আচার্য্যরা সমবেত হয়েছেন। আখড়াপতি পুষ্পমাল্য নিয়ে বৈষ্ণবোচিত ব্যবহারে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—'জগন্নাথ তত্ত্ব' আমরা কিছু কল্পনা করতেও অক্ষম। হে সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ, তার রহস্য আপনি যেমন জানেন তেমনি প্রকাশ করুন। বৈষ্ণবের 'ত্রয়ো' তত্ত্বকে স্বীকার ক'রে বিনম্রভাবে বললেন, চিন্তামণি তত্ত্ব কোন সাধুবর জানেন কি? সবাই বললেন, সর্ব দেবময় কৃষ্ণ, বৈষ্ণব ভেদে তিন দৈবতের প্রাধান্য আছে। 'নারায়ণ' মহামন্ত্রে সন্ন্যাসীগণ আর 'শ্রী' মন্ত্রে বৈষ্ণবগণ সাধন করেন। রামানন্দীরা রামচন্দ্রের প্রভাবকে স্বীকার করেন। অন্য সকলে কৃষ্ণ ভগবানকে মান্যতা দেন। কৃষ্ণ নারায়ণ রাম এই তিন পূজা সর্ব প্রসিদ্ধ। এ ব্যতীত আর কোন নাম এমন ভাবে ব্যবহৃত হয় না। বৈষ্ণবগণ, সন্ন্যাসীগণ, আপনারা জগমোহনে যান, নীলাদ্রি নিবাসী জগন্নাথ দর্শন করুন। এই কথা

বলে গোরা সেখানে বসে মহামন্ত্র কীর্তন আরম্ভ করলেন। সবাই জগমোহনে গেলেন। দেখলেন সিংহাসনে এক অপূর্ব মূর্তি। শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ ছন্দে দাঁড়িয়ে আছেন। পীতাম্বর, গোপীচন্দন বিলেপিত অঙ্গে, মুকুট শিখি পাখা বিশোভিত হয়েছেন। বক্ষদেশে মুরলী শোভমান। আরও চারটি হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করেছেন। আরও দুটি হাতে ধনুক এবং বাণ ধরেছেন। অষ্টভুজ মূর্ত্তি এই এক মূর্ত্তিতে কৃষ্ণ নারায়ণ রাম ত্রিমূর্ত্তির প্রকাশ। সর্ব সম্প্রদায়ের ইষ্টমূর্ত্তি একত্রে দর্শন ক'রে সকলে 'কৃষ্ণ চিন্তামণি তত্ত্ব' লাভ করলেন। রাজপুর বর্গ প্রধান আচার্য্য এবং পুষ্প ঘোষ এইরূপ দেখে চকিত হয়ে গেলেন। সকলে এসে বেড়ার ভিতরে চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণাম করলেন। জয় জয় ধ্বনি করলেন। বললেন সর্ব বৈষ্ণব বিষয়ের সার কৃষ্ণ চিন্তামণি নাম সার্থক। আপনার জন্য জগতে এই মূর্ত্তি প্রকটিত হল। হরে কৃষ্ণ নাম, মন্ত্রের প্রতীক। যে স্থানে মোহন্তরা বসেছিলেন সেই স্থান এই স্মৃতি অবলম্বনে 'কীর্তন মণ্ডলী' নামে খ্যাত হল। আর সংকীর্তনের জন্য স্থানটি নির্দ্ধারিত হল। আচারী, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, রামানুজ সব সম্প্রদায়ের এক সমন্বয়স্থল রূপে বিদিত হ'ল। জগন্নাথ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ চিন্তামণি নন্দনন্দন ভাবে ত্রিরূপের সমাবেশ। এই মূর্ত্তি দর্শন ক'রে সকলে 'জয় গৌর' 'জয় গৌর' ব'লে উঠলেন আর সংকীর্তন নিয়ে প্রভু গম্ভীরায় চলে গেলেন। এক বছর প্রভু গম্ভীরায় একান্তে বাস করলেন। মহাপ্রসাদ সেবন, ভাগবতপাঠ, সমস্ত বৈষ্ণব সঙ্গে মিলন। কেবল তাই নয়, শাসনী ব্রাহ্মণ, অবধূত, শূন্যবাদী সকলে এই ক্ষেত্রে নামবাদী হয়ে গেলেন।

একদিন সিংহারী ভিতর পরিচ্ছা (যিনি মন্দিরের ভিতর পরীক্ষা করেন) কৃষ্ণলীলা স্মরণ ক'রে গম্ভীরায় উপস্থিত হয়ে 'দুগ্ধমেলান' তত্ত্বকে প্রকাশ করলেন। প্রভুর মন উচাটন হল। নিশাকালে সেবক শঙ্কর গোবিন্দ একদিন দেখলেন—গম্ভীরাতে প্রভু নেই। সমস্ত বৈষ্ণব আকুল ক্রন্দন করে উঠলেন আর গৌরকে না দেখে বনে বনে সন্ধান করতে লাগলেন। সেই 'দুগ্ধমেলান' যাত্রায় গোপাল শ্রেষ্ঠীর বাড়ী থেকে গো-

গোষ্ঠ যাত্রা করলেন। প্রভু সেই গো-গোষ্ঠের যাত্রায় কৃষ্ণের মতন নৃত্য করে রামকৃষ্ণ উৎসব মূর্ত্তির পিছনে পিছনে অনুসরণ করলেন। 'জগন্নাথ বল্লভে'র কাছে অপূর্ব গো-গোষ্ঠের উৎসব দেখে প্রভু বাছুরের মত (বচ্ছতরি) সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। সমস্ত গরুগুলো কৃষ্ণ অঙ্গ মনে ক'রে চাটতে আরম্ভ করলো। প্রভু হাত পা দুমড়ে মাটিতে পড়ে রইলেন। এই অপূর্ব বাল্যলীলা স্মরণের সময় সব বৈষ্ণবরা প্রভুকে গম্ভীরায় নিয়ে এলেন।

প্রতি দোলপূর্ণিমার দিন প্রভু হিন্দোলার সামনে কীর্তন করেন। চন্দন যাত্রা উৎসবে পথে সংকীর্তন করেন। গৌড় দেশের ভক্তগণ এই সময় পুরী ক্ষেত্রে এসে সমবেত হন। প্রতি জন্মাষ্টমীর দিন প্রভুকে দেখা যায় হরে কৃষ্ণ নামে বিভোর। স্খলিত চরণ প্রভু পড়ে যাওয়ার উপক্রম। বাম হাতের তিন আঙ্গুলে দেওয়াল ধ'রে সামলে নিলেন। গোপীনাথ পট্টনায়কপ্রভুর চেতনা ফিরিয়ে আনলেন। গোপীনাথ আচার্য্য, কানাই ঘুন্টিয়া প্রভুকে ধরে রাখলেন। অন্যতম মুখ্য সেবক পরিচ্ছা দেখলেন সেই দেওয়ালে অঙ্গুলী চিহ্ন গর্ত্ত সৃষ্টি করেছে। কেবল তাই নয় যেনামণি গ্রহরাজ দেখলেন পাথরের মেঝেতে পদচিহ্নও রয়েছে। সকলে বুঝলেন প্রভুর প্রভাবে পাষাণও দ্রবীভূত হয়ে যায়। আদেশ হল, এই চিহ্নকে পবিত্র ভাবে রক্ষা কর। চৌদ্দশত ছিয়াল্লিশ শকে (১৫২৪ খৃঃ) রাজার আদেশে সেটি সুরক্ষিত হল।

পরদিন প্রভু দেখলেন, নন্দোৎসব লীলামাধুরী। ভিতরছ পরমানন্দ মহাপাত্র সুবর্ণ মুকুট ইত্যাদি নানা অলংকারে সজ্জিত হয়ে নন্দ-রাজার বেশে সেজেছেন। সাদা কাপড় পাকিয়ে স্ফীত উদর করেছেন। লাবণ্য দেবদাসী যশোদা হয়েছেন, গৌরী দেবদাসী হয়েছেন রোহিণী। ললাটে তিলক, কণ্ঠে তুলসীর মালা, কটিদেশে সুবর্ণ অলংকার। তারা সকলের মন আকর্ষণ করছে। উৎসব দেখতে দেখতে—'হা পিতা, হা পিতা ব'লে গোরা সংকীর্তন করতে আরম্ভ করলেন। নন্দরাজার অনুসরণ করলেন। মন্দির থেকে বেরিয়ে রাজবাটী গেলেন। সেখান থেকে গম্ভীরা,

তারপর জগন্নাথ দাসের মঠ ঘুরে মন্দিরের, ভিতর কৃষ্ণ বলরামের প্রতিমা কোলে ক'রে দুধ খাওয়াতে লাগলেন। প্রভু বালকের মত ক্রন্দন করছেন। আমাকে ক্ষীর দাও। আমি সেই নন্দের নন্দন! তুলার সলতে ক'রে যেমন শিশুদের দুধ খাওয়ায় তেমনি করে ভিতরছ দুধ নিয়ে মহাপ্রভুর মুখে দিতে লাগলেন। 'ওগো আমার বাবা গো' বলে গোরা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সেই থেকে পরমানন্দ মহাপ্রভুকে পুত্র বিচারে বাড়ীতে মহাপ্রভুর ছোট্ট ধাতু প্রতিমা ক'রে পূজা করতে আরম্ভ করলেন। পূজার সিংহাসনে মহাপ্রভুর বিগ্রহ পূজা এই সুরু হল।

কার্ত্তিক দ্বাদশীর প্রভাত। ভগবানের স্নানের পরে কানাই খুন্টিয়া, শিখি মহান্তি আর দামোদর সিংগারী জগন্নাথের পাদোদক নিয়ে গম্ভীরায় এলেন। তখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত গম্ভীরায় ভাগবত পাঠ করছেন। বৈষ্ণবগণ নিবিষ্ট হয়ে শুনছেন। এই সময় সেবকরা জগন্নাথের মুখ ধোয়া জল আর দাঁত মাজার দাঁতন কাঠি নিয়ে গদগদ হৃদয়ে প্রভুর কাছে এলেন। প্রসাদ দিলেন প্রভুর মুখে। প্রভু হরি হরি বলে প্রসাদ নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসকে এই প্রসাদ দিয়ে এসো। সকলে টোটার সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করে হরিদাসের কুটিরে উপস্থিত হলেন। দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগের জল তাঁর মুখে দেবার সময় হরিদাস বললেন, আমি পতিত আমাকে স্পর্শ করবেন না। আমার মুখে এই প্রসাদ আপনারা দিলেন এ আমার মহাভাগ্য। শিখি মহান্তি হরিদাসের মুখে কাঠি প্রসাদের জল দিলেন। মহামন্ত্র উচ্চারণ করে হরিদাস সে প্রসাদ আস্বাদন করলেন। জগন্নাথ নাম নিয়ে সেই দাঁতন কাঠিপ্রসাদকে নিয়ে মার্গশীর্ষ কৃষ্ণ পঞ্চমীর দিন মাটিতে পুঁতে দিলেন। সাত দিন পর দেখা গেল দন্তকাষ্ঠটি পল্লবিত হয়েছে। ব্রহ্মের ব্যবহৃত দ্রব্য ব্রহ্ম হয়ে যায়। এই তার প্রমাণ। উদ্দণ্ড কীর্তন সুরু হল সেই বৃক্ষকে পরিক্রমা করে। জগন্নাথের প্রসাদ বলে বৃক্ষকে পূজা করলেন। প্রতিদিন হরিদাস বৃক্ষ মূলে জল দিতেন। দেখা গেল প্রভুর কর স্পর্শে দন্তকাষ্ঠ মহাবৃক্ষ সিদ্ধবকুলে পরিণত হল। জগত পাবন প্রভু চৈতন্য ঠাকুর নাম প্রেম দানে সকলকে করলেন উদ্ধার।

মার্গশীর্ষ শুক্লপঞ্চমীর দিন প্রভু জগন্নাথ জীনবস্ত্র (পাতলা কাপড়) পরিধান করেন। সেদিন ফুলের মালা ‘গভা’ চূড়া মুকুট কৌস্তুভ পদক কিছু পরানো হয় না। এমন কি রাধা নামাঙ্কিত বস্ত্রও অঙ্গে দেওয়া হয় না। গোপাল বালকের বেশ। গৌড়িয়া বেশ দেখে প্রভু বিমোহিত হলেন। বললেন, হে পরমানন্দ মহাপাত্র আমাকে বুঝিয়ে দাও এই বেশের রহস্য কি ? পরমানন্দ বললেন, আগামী কাল থেকে শীতবস্ত্র লাগানো হবে। আজ জীন বা পাতলা বস্ত্র পরে জগতের ঠাকুর শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। ঋতুশ্রেষ্ঠ শীতের সঙ্গে লীলা করে দেখাবেন আপনার অপূর্ব শক্তি। শীতের সঙ্গে এই ক্রীড়ার বিবরণ শুনে প্রভু গৌরহরি মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ‘হা প্রাণনাথ’ বলে ওড়িয়া ভাষায় গান ক’রে উঠলেন। গোপীভাবের আশ্রয়ে মাধবী দাসীর রচিত এই ওড়িয়া গীতি বিশ্বম্ভর ভাবাবেশে সকল সেবকের সামনে গাইলেন। প্রভু শ্রীমুখে ওড়িয়া গীতের তিনটি পদ শুনে সকলে মুগ্ধ। এবার প্রভু নিজের গায়ের উত্তরীয় খুলে ফেলে দিলেন। মহাভাবে রোমাঞ্চিত হলেন। বললেন, দেখ, আমি শীতকে জয় করেছি। আমার প্রভুর ভাব আমার অঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। এই ব’লে গোরা উড়িয়া গানটি গাইতে লাগলেন। সকলে গোরার সঙ্গে গাইলেন। গীতটি মনে পড়ছে,—

জগমোহনে পরিমুণ্ডে (অন্তভাগে) যাই
মন আমার মাতিলা রে
কোলা চন্দ্রমা চাঁহি।

বিধুবদন দেখলাম। গোপী-হৃদয় চন্দন তার অঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমি যুগ যুগ ধরে সেই মূর্ত্তিকে দেখছি। গোসা (ধুয়া) পদ দিয়ে বললেন

মন আমার মেতে গেল

কাল চন্দ্রমা দেখে—

হে রসিকবর, শুন হে নট নাগরবর

নব কৈশোরবর মধুর ছন্দাপদ,

নাম তোর রখেছ সদা

আমার মুখে হে গোসাই ॥

মন মাতিলরে (গোসা)

কাল চন্দ্রমা দেখে।

আমি তো প্রেমের চকোর, তুমি প্রেমী সুধাকর। প্রেমাস্পদ আমার প্রেমের মহাভাব। হে নাথ, যুগে যুগে তুমিই আমার প্রভু,

আমার মন মাতিল রে

সেই কাল চন্দ্রমা দেখে।

এই পদটি গান ক'রে, প্রণাম ক'রে গরুড় স্তম্ভকে ঘনঘন আলিঙ্গন করলেন। একদৃষ্টিতে বহুক্ষণ জগন্নাথকে দেখলেন। তারপর প্রসন্ন মনে গম্ভীরায় চলে গেলেন।

গম্ভীরাতে বৈষ্ণবগণ জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু 'গীত গোবিন্দ কিংবা রাধা' নামাঙ্কিত খণ্ডুয়া বস্ত্র সেবকরা কেমন ক'রে অঙ্গে ধারণ

করেন। এতে কি অপরাধ হয় না? পুণ্ডরিক মনের সংশয় প্রকাশ করলেন। প্রভু-নীরব। রায় রামানন্দ উত্তর দিলেন। ভক্তের মধ্যে রয়েছে রাধার ভাব। আবার ভক্তই কৃষ্ণের শরীর। তাই রাধা নামাঙ্কিত বস্ত্র পরেন শ্রদ্ধা ভরে। সেই প্রেমের বসন গোপীভাবে ভাবিত সেবকগণ অঙ্গে জড়িয়ে রাখেন। এতে কোন অপরাধ হয় না। এ তো প্রীতির লক্ষণ।

দোলযাত্রায় প্রভু ভক্তদের নিয়ে কীর্তন করেন। সুগন্ধি আবীর পরস্পর অঙ্গে লেপন করেন। গম্ভীরায় প্রভুর জন্মোৎসব পালিত হয়। উৎসবে ঊনষাট বৈষ্ণব গোষ্ঠীর মিলন হয়। দোলপূর্ণিমার দিন গম্ভীরা থেকে যাত্রা ক'রে ভক্তিভরে মন্দিরে আসেন প্রভু। কৃষ্ণতত্ত্ব শ্রবণে বৈষ্ণবগণ তন্ময় হয়ে থাকেন। একদিন এমনি এক উৎসবের দিনে স্বয়ং বল্লভাচার্য্য এলেন। প্রভুকে বললেন, গীতাই একমাত্র শাস্ত্র। উপাস্য একমাত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ। প্রভু ভাবাবেশে বললেন, ভাগবত বাণীই সার। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা। তর্কের দ্বারা হে বল্লভাচার্য্য কখনও সিদ্ধি হয় না। ভাগবতের লীলাই শ্রেষ্ঠ। সবাই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তকে স্বীকার করলেন। প্রভু নির্বিকার চিত্তে গম্ভীরায় যাত্রা করলেন।

চৈত্র মাসের শুক্ল সপ্তমী তিথি। মহাপ্রভু প্রাতঃকালে সমুদ্রে স্নান ইচ্ছা করলেন। গলার মালা শুষ্ক হয়ে গিয়েছে। প্রভু সংকীর্তন নিয়ে চলে'ছেন। বালির পাহাড়ের উপর দিয়ে যাবার সময়ে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। চিত্ত উদ্বেল। কৃষ্ণ দরশনে যমুনা যেমন উছলে ওঠে তেমনি। দৃষ্টি বাম দিকে হেলা। চোখের কোল সজল হয়ে উঠলো। বললেন, দেখ দেখ এই তো সেই গিরি গোবর্দ্ধন। দেখ, এই পর্বতকে কৃষ্ণ করাঙ্গুলিতে ধারণ করেছিলেন। ধন্য এই পর্বত। কৃষ্ণ লীলার মহান সাক্ষী। একদিন এই গিরি গোবর্দ্ধন গোপীদের আর গোপালকে রক্ষা করেছিল। প্রভুর ভাব দেখে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। প্রভু অতি দ্রুত চলতে আরম্ভ করলেন। 'অচিয়া'র কাছে সেই বালুকা দৃষ্টি গোচর হল। প্রভু তার উপর উঠলেন। বৈষ্ণবগণ উঠতে পারলেন না। খঞ্জ, কৃশ স্থূল সকলে গলদঘর্ম হয়ে প্রভুর সঙ্গে দৌড়তে লাগলেন। কিন্তু প্রভু

গোবৰ্দ্ধন মনে ক'রে তার উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। । প্রভু নিজের মনে বলে চলেছেন, হে কৃষ্ণ, হে বাসুদেব, হে দেবকী নন্দন, হে নন্দেগোপ কুমার, হে গোবৰ্দ্ধন ধারী। আবেশ ঘন হচ্ছে। কাঁটা ফুলের উপর প্রভু গড়াগড়ি দিচ্ছেন। লোমকূপগুলি বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ভক্তগণও তাই দেখে বালির পাহাড়ের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। গোবৰ্দ্ধন পরিক্রমা কীর্তন আরম্ভ হল। রায় রামানন্দ 'গীতগোবিন্দ' গান করতে লাগলেন।

অশেষ বিদ্যার অধিকারী অচ্যুতানন্দ গোস্বামী একদিন এলেন। নিত্য ধ্যান ত্রাটক অভ্যাস করেন। যোগতত্ত্বের আচরণ শীল মহাত্মা। ব্রহ্ম গোপাল নাম সংকীর্তনেও অশেষ রুচি। অচ্যুতানন্দ তাঁর পিতা দীনবন্ধু খুন্টিয়াকে গিয়ে বললেন, আমার ধ্যানের সম্বল চৈতন্য গোসাই নামের অবতার। তাঁর অভিমত নামী হতে 'নাম' শ্রেষ্ঠ। তিনি বৰ্ত্তমানে নীলাচলে লীলা করছেন। নাম ভক্তির প্রভাবে জগতকে ত্রাণ করছেন। জগন্নাথ তত্ত্বের মর্ম তিনি ভাল করে জানেন। যুগলতত্ত্বের ভেদ উভয়ই তাঁর জানা আছে। চলো পিতা তাঁর পাদপদ্ম দর্শন করি। আমরা কিছু বলব না। কিন্তু আমার মনের বাসনা আমি তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করবো। জগৎজনের গুরু চৈতন্য ঠাকুর কলির উদ্ধারণ লীলা জানেন। চৌদ্দশ ছত্রিশ শকাব্দ বৈশাখ শুক্ল অষ্টমী। সেদিন মহাপ্রভু নীলাদ্রি মহোদয়ের অষ্টমী যাত্রায় মিলিত হবেন। নীলাদ্রি ঠাকুর আমার প্রাণ। চৈতন্য তারই ভাব-অবতার। তিলকণা গ্রাম থেকে সাধক অচ্যুতানন্দ নিজ পিতার সঙ্গে দশজন শিষ্য নিয়ে বৈশাখ শুক্ল সপ্তমীর দিন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান করে গন্ধর্ব বটের নীচে বিশ্রাম করে আপনার পট্টশিষ্য রামদাসকে সঙ্গে নিয়ে পিতৃচরণ বন্দন পূর্বক মন্দিরে প্রবেশ করলেন। জলকুম্ভ যাত্রা হচ্ছিল। যাত্রা দর্শন ক'রে পবিত্র পাদোদক পান করার পর মনে হ'ল আজ সর্ব তীর্থ স্নানের যোগ ছিল। দ্বিপ্রহরে রামকৃষ্ণ মদনমোহন আদি চন্দনযাত্রার জন্য শিবিকা আরোহনে যাত্রা করেন। মহাপ্রভু শিবিকার সামনে রসানুগ কীর্তন করে

চলেছেন। দূর থেকে অচ্যুতানন্দ নয়নভরে এ দৃশ্য দেখলেন। বৃদ্ধ পিতাকে দেখালেন। সংকীর্তন নামগান চলতে লাগল। ভাবের দ্যোতক অশ্রুতে চোখ ভরে গেল। অচ্যুতানন্দ নরেন্দ্র সরোবর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসার সময় পথে মহাপ্রভুকে প্রণাম করলেন। নদীয়াচন্দ্র বললেন, 'সাধক এখানে কেন পড়ে আছ? ওঠো। অচ্যুত বললেন, প্রভু আপনি কাম কল্পতরু। আমার মনোবাসনা আপনি জানেন। হরির অপার কৃপায় আমার হৃদয়ে আজ মহাভাব জাগ্রত। প্রভু বললেন, আমি তো দীক্ষা দিই না। তুমি সনাতন গোস্বামীর চরণ ধর। তিনি তোমাকে দীক্ষা দেবেন। জানবে আমি আদেশ করছি। মহাপ্রভুর আদেশে সনাতন প্রভু বৈশাখ শুক্ল একাদশী সোমবার প্রাতঃকালে, কল্পবৃক্ষের মূলে মন্ত্র দান করলেন। অচ্যুতানন্দ বললেন, সেই মন্ত্র আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে ধন্য করেছে। হরেকৃষ্ণ নাম বীজ প্রদান করে রাধা ভাবের গুহ্য কথা আমাকে উপদেশ দিলেন। সর্বজীবে দীক্ষা দাতা চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, সর্ব বিদ্যা সাধনে মোক্ষ ফল নেই। মহামন্ত্র কীর্তনে অপার আনন্দ। সেই মহামন্ত্র গ্রামে গ্রামে প্রচার কর। গন্ধর্ব মঠের কাছে গোছন্দ বট আছে, সেখানে নাম-সংকীর্তন কর। অচ্যুতানন্দ নিজে শূন্য যোগ আচরণ করলেও চৌষট্টি গ্রামে নাম প্রচার করলেন। ইনি অনাগত ভবিষ্যতের কথা ব'লে নাম প্রচার করতে লাগলেন। এই ভবিষ্যৎ বাণীগুলি আজও একে একে সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

চতুর্মাস্যার জন্য মহাপ্রভু গম্ভীরায় একান্ত বাস শুরু করলেন। ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীর দিন টোটা গোপীনাথ মন্দিরে বৈষ্ণব পূজন হল। বয়ঃ বৃদ্ধ গদাধর পণ্ডিত বললেন আমি আর বিগ্রহের সেবা করতে পারছিনা। শোকাতুর হয়ে গদাধর নিবেদন করলেন, সেবার জন্য অন্য বৈষ্ণব নিযুক্ত করুন। আমার অক্ষম শরীরের অপরাধ ক্ষমা করুন। প্রভু বললেন, গোপীনাথ আর আমি, তোমার সেবা ভিন্ন আমাদের দুজনের সুখ হয় না। কাল অবধি অপেক্ষা কর। তোমার ভাবানুযায়ী ফল দেবো। তোমার সেবা সুখ আমি ত্যাগ করবো না। প্রভু গম্ভীরা থেকে টোটা

গোপীনাথ গেলেন। গদাধরের হাত ধরে শঙ্কর দ্রুত এগিয়ে এলো। স্বরূপ রামানন্দ রায়কে কাছে বসিয়ে শ্রীচৈতন্য বললেন, গদাধরের প্রাণ গোপীনাথ। গোঁসাই মনে করছে আমি বুড়ো হয়েছি সেবায় অক্ষম। কাল আমি তার ইচ্ছা পূর্ণ করব। পরদিন ভোরবেলা বৃদ্ধ গদাধর সেবার জন্য মন্দিরে গেলেন। প্রার্থনা করলেন। বললেন, ওঠো গোপীনাথ, আমার প্রাণের ঈশ্বর। নিশি অবসান হয়েছে, ওঠো আমার প্রিয় রাধানাথ। কপাট খুলে গদাধর পণ্ডিত মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বৈষ্ণব মধুদাস তাঁকে তুলে ধরলেন। দেখলেন, গদাধরের সেবা নেবার লোভে পাথরের বিগ্রহ গোপীনাথ নিচু হয়ে বসে পড়েছেন। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে বৈষ্ণব মণ্ডলীর সকলেই সেখানে উপস্থিত হলেন। মহাপ্রভু বললেন, দেখ আমাদের ঠাকুর তোমার সেবা নেবার জন্য বসে পড়েছেন। যতদিন জীব শরীর থাকবে ততদিন তুমি সেবা কর। তোমার সেবার জন্য স্বয়ং নন্দনন্দন লোভাতুর। রাজা, জনসাধারণ সকলেই এই অপূর্ব দর্শনের জন্য সেখানে গিয়ে নাম করতে লাগলেন। ভুবনপাবন নাম ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হল। ভাবগ্রাহী প্রভু, ভাব অনুসারে লীলা প্রকাশ করলেন। জগতে প্রভুর মহিমা প্রচারিত হল।

অমাবস্যার দিন প্রভু বেড়া সংকীর্তন ক'রে মেরদা বিশ্রাম গৃহে বসেছেন। থরে থরে সুগন্ধে ভরা উপন নৈবেদ্য আনা হচ্ছে। বিশিষ্ট নৈবেদ্য 'সপ্তপুরী', ভোগের পর মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। প্রভু বললেন, এ ভোগের বৈশিষ্ট্য কি ? শিখি মহান্তি বললেন, আজ সপ্তপুরী অমাবস্যা, যেমন গোবর্দ্ধনে অন্নকূট হয় তেমনি পুণ্য নীলাচলে শকট পরিমাণ পিষ্টক আজ ভোগ দেওয়া হয়। নিবেদনের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়ে ফুটে ওঠে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রীতি। প্রভুর সামনে সেই প্রসাদ নিয়ে গেলে প্রভু প্রসাদকে সম্মান দেখালেন। নৈবেদ্য মাথায় স্পর্শ করে আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করলেন। বললেন, দেখ এই পিষ্টকের ওপর বিষ্ণু লক্ষণ। সবাই দেখলেন, জগন্নাথের প্রসাদের ওপর শঙ্খ চক্র জ্যোতিঃ। আর বলভদ্রের প্রসাদের উপর হল মুষলের জ্যোতিঃ। সুভদ্রার প্রসাদের ওপর রাধা স্বরূপে পদ্ম চিহ্ন। সকলে প্রণাম ক'রে 'উপন'

প্রসাদ গ্রহণ করলেন। প্রসাদের উপর আয়ুধ জ্যোতি দর্শন করে সবাই কৃত কৃতার্থ হলেন। ভোগের সঞ্চালক রাজগুরু এই লক্ষণ দেখে পাচক বর্গকে আহ্বান ক'রে বললেন, এই মহান নৈবেদ্যের উপর আজ থেকে তোমরা পূর্ব বর্ণিত ক্রমে 'বিষ্ণু আয়ুধ' প্রভৃতি চিহ্ন চিত্রিত করো। এই পদ্ধতির প্রচলনও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরই মহিমা।

আর এক মহিমা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রকটিত হল। মন্দিরে নৃসিংহ মূর্ত্তির সম্মুখে বেদী রয়েছে। মুক্তি মণ্ডপ। এখানে কাষ্ঠ নির্মিত মণ্ডপ ছিল। রাজা প্রতাপরুদ্র, রাজগুরু গোদাবরের পরামর্শে বীর প্রতাপপুর শাসন, ব্রাহ্মণদের দান করেন। শকাব্দ চৌদ্দশ চুয়ান্ন। মুক্তিমণ্ডপটি পাথর দিয়ে নির্মাণ করলেন। ছাতের উপর শিল্পীরা নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারের মূর্ত্তি স্থাপন করলেন। সেই সময় শ্রেষ্ঠ শিল্পী সংকীর্তনরত চৈতন্যদেবের একটি মূর্ত্তি, গভীর ভক্তি সহকারে ঐ মণ্ডপে স্থাপন করলেন। একশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা দাবী করলেন মণ্ডপে ঐ মূর্ত্তি স্থাপন অনুচিত। জীবদেব তখন রোগশয্যায়, তিনি মৌন রইলেন। সর্বসাধারণ ভক্তরা বললেন, এ মূর্ত্তি থাকবে। রাজা কটক থেকে সচিব প্রেরণ করলেন। বললেন সকলের যা মত তাই করব। সেবক পরিছা সাহির প্রধান মঠধারী সামন্ত সবার যা মত সেই মত গ্রাহ্য হবে। কাশী মিশ্র সভার মধ্যে বললেন—সত্য যুগে তপস্যা, ত্রেতা যুগে যজ্ঞাচার, দ্বাপরে সেবা, কলিতে নামের প্রচার এই হ'ল যুগধর্ম। সেই নামের প্রচারে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁকে সবাই শ্রেষ্ঠ বলেন। মুক্তিমণ্ডপ পাপ-সন্তাপের বিনাশক। তেমনি শ্রীচৈতন্য পাপসন্তাপহারী হরিনামের প্রচারক। কোন কোন মহাত্মা এখানে এসে মান্যতা সূচক উপাধি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে এসে পাপের বিনাশ করছেন। তিনি জগন্নাথের প্রিয়। সেই জন্য মন্দিরে তাঁর মূর্ত্তি স্থাপন উচিৎ মনে করি। রাজা সকলের যা মত, সেই মত স্বীকার করলেন। কটক থেকে হুকুমনামা গেল। কীর্তন গোষ্ঠী সহ চৈতন্য মূর্ত্তি মুক্ত মণ্ডপে স্থাপন ক'রে মণ্ডপের শোভা বর্দ্ধন করা হল। নাম ভক্ত শ্রেষ্ঠ গোরার, ভাবমূর্ত্তি দেখে ব্রাহ্মণ ভট্টমিশ্রের চিত্ত ভক্তি রসে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কাশী মিশ্র ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মভোজ প্রদান করলেন।

একদিন মহাপ্রভুর মনে হ'ল, সার্বভৌম মহাশয় বাস্তবে তাঁদের পথের সাধকও নয়, পরিপন্থীও নয়। প্রভু আবদার করলেন, তুমি আমাকে জগন্নাথের একটি প্রাচীন লীলাচরিত শোনাও। সার্বভৌম বললেন, শোন, কার্ত্তিক মাসে এখানে 'বালধূপ' বলে একটি বিশেষ উৎসব হয়। রাধা দামোদর এবং জগন্নাথ এক অঙ্গ। এই সময় জগন্নাথ 'রাধা দামোদর বেশে' সাজেন। জগন্নাথের একজন সেবক ছিলেন তার নাম 'তরিজ' মহাপাত্র। একদিন জগন্নাথের প্রসাদী নাসার বিশেষ অলংকারটি তরিজ গোপনে তার দাসীর মাথায় পরিয়ে দিলেন। এই প্রসাদী অর্ঘ্যে রাজারই অগ্রাধিকার। আর ঠিক সেইদিন হঠাৎ নির্ভীক রাজা ভানু জগন্নাথ দর্শন করতে এলেন। কি হবে ? ঐ নির্মাল্য যে রাজার প্রাপ্য। দাসীর কাছ থেকে ঐ ফুল সাজ ফিরিয়ে নিয়ে এসে তরিজ চুপি চুপি রাজাকে দিলেন। রাজা গ্রহণ করলেন কিন্তু সেই নাসা অলংকারে একটি লম্বা চুল ছিল। ফুলের মধ্যে স্ত্রীলোকের চুল দেখে রাজা মূহুর্ত্তে রেগে উঠলেন। সেবকের দৃঢ়াভক্তি। বললেন, আমার কোন দোষ নেই। কেন প্রভুর মাথায় কি চুল নেই ? ওটা জগন্নাথের মাথার চুল। আপনি এসে দেখুন চুল আছে কি না ? রাজা দেখলেন—জগন্নাথের মাথাভর্ত্তি চুল। এই কেশদাম দর্শনের পুণ্য স্মৃতিতে কার্ত্তিক মাসে 'বালধূপ' নামক এক স্বতন্ত্র পূজা-ভোগ প্রচলন করলেন। এই বালধূপ বাল্যভোগ নয়। সার্বভৌম এই চরিত বিশদভাবে কীর্তন করছিলেন। গোরার মন মুগ্ধ হয়ে গেল। গম্ভীরার অধিপতি চৈতন্য-প্রভু আজ্ঞাপত্র দিলেন, তুমি প্রতি বছর কার্ত্তিক মাসে মন্দিরে এই সংকীর্তন করবে। তোমাকে কীর্তনের অধিকারী ব'লে স্বীকৃতি দিলাম। 'গঙ্গামাতা মঠ' এই অধিকার প্রাপ্ত হ'ল। শোভাযাত্রার বিশেষ অলংকার, ছত্র, তরাস, চামর ইত্যাদি বহু বৈভব তাদের দেওয়ালেন। সিদ্ধির মূল প্রভু চৈতন্য নিজে কিন্তু দীনভাবে মাটিতে লুটিয়ে রইলেন। গম্ভীরার সব ভক্তরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। একজন দাম্ভিককে কেমন ক'রে প্রভু সংকীর্তনে বিমোহিত করলেন।

ভাদ্র শুক্ল চতুর্দশী। হরিদাস শীর্ণ দেহ ত্যাগ করবেন। মহামন্ত্র কীর্ত্তন করছেন হঠাৎ বললেন, এনে দাও আমার প্রাণের ধন গৌরাঙ্গকে।

গোরা আমার চোখের জ্যোতিঃ নয়নের মণি। তাঁর শ্রীমুখ খানি দেখে আমি শরীর ত্যাগ করব। গৌরাঙ্গ ঠাকুর ব্যগ্র হ'য়ে ছুটে এলেন। জগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র ও মালা হরিদাসের গলায় পরিয়ে দিলেন। নাম করতে করতে মুখে দিলেন মহাপ্রসাদের কণিকা। 'হায় আমার প্রিয়জন' বলে প্রভু ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। হঠাৎ উঠে তার কৃশ তনুটি কোলে তুলে নিলেন। সংকীর্তন ধ্বনি উঠল। 'হরি হরি হরিদাস' নাম উচ্চারণ করতে করতে সবাই স্বর্গদ্বারের পথে চললেন। 'শাক্ত আসন' মঠের সামনে রাখো বলে আদেশ দিলেন। কৃষ্ণের কোলে শুয়ে কৃষ্ণের পরম ভক্ত হা-কৃষ্ণ ব'লে জীবন ত্যাগ করলেন। প্রভু হরিদাসকে নিজের হাতে অন্তিম শয়নে শুইয়ে দিলেন। জগন্নাথ সিংহদ্বারে প্রভু হাত পেতে ভিক্ষা চাইলেন। তারপর হরিদাসের নির্য্যাণ মহোৎসব ক'রে সব ভক্তজনদের হরির মহাপ্রসাদ বিতরণ করলেন। নিজের হাতে হরিদাসের গোলক সমাধি দিয়ে গম্ভীরাতে তিনমাস মৌনব্রত সাধনে পড়ে রইলেন। বললেন, নীল নীলাদ্রি শৈলবাস, নন্দ নন্দনের পাদাব্জ সেবন, হরি তোমার উচ্ছিষ্ট প্রসাদের ভূরি ভোজ আর নাম কীর্তন আমার একমাত্র প্রেয়, আমার একমাত্র শ্রেয়।

এই ভাবে নাম প্রবাহে কলির জীবনিস্তারে গৌরচন্দ্রের দিন কেটে যায়। পৌষ মাসে মৌনভঙ্গ করলেন। সেই পৌষমাসে মন্দিরে বাৎসল্য রসের সেবা হয়। রাত্রি অবসানে সেবকসমাজ প্রসাদ নিয়ে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কাছে উপস্থিত হলেন। গৌরচন্দ্র তাদের আলিঙ্গন করলেন। বললেন, দেখ, হরিদাস কৃষ্ণের কাছে চলে গেল। প্রভু, তুমি ভাল আছ তো ? এই কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে সকলেরই চোখ জলে ভরে গেল। জয় গৌর জগন্নাথ বিদগ্ধ মুরতি, গৌর তোমার জয় হোক, বলতে বলতে সেবকরা ফিরে এলেন। সকলের 'সেবা করার ইচ্ছা হল। বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দকে ডাকলেন, এসো আগে জগন্নাথের দিব্যানন্দ প্রসাদ গ্রহণ কর। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রসাদের মৃত্তিকা পাত্র ধরেছেন। রঘুনাথ নাম করতে করতে প্রভুকে পরিবেশন করছেন। মহাপ্রভু আর সার্বভৌম বেদীর উপরে বসলেন। আর সকলে বেদীর পাশে বসলেন।

নয়নে অশ্রু টলটল করছে। প্রভু বললেন, ভাগবতের বনভোজন লীলার কথা তোমাদের মনে আছে তো? গোষ্ঠে মায়ের দেওয়া পুঁটলি খুলে গোপ বালকরা কেমন সবাই একসঙ্গে গোপাল কৈবল্যপ্রসাদ সেবা করেছিলেন। প্রসাদের জাতিপাতি, কুলজ্ঞানের কোন বালাই নেই। কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজনের সুখ বর্ণনা করা যায় না। শুষ্ক হোক, পচা হোক, গলা হোক আর চণ্ডালের ঘরেই হোক, প্রসাদ প্রাপ্তি মাত্রে ভুঞ্জিতব্য। দেশ কাল বিচার যেন কখনও না জাগে। পাওয়া মাত্র ভক্তি ভরে মাথায় হাত দেবে। প্রসাদের হাঁড়ির ধারে যদি কণিকামাত্রও লেগে থাকে সেই কণিকা গ্রহণ করলে পাপের কোন চিহ্ন থাকবে না। এই কথা ব'লে বড়া, ঝুরো, চূড়াভাজা, খিচুড়ি সব একত্র ক'রে শুষ্ক পিণ্ডের মতো সকলকে দিলেন গ্রহণ করার জন্য। সকলে প্রসাদ পেয়ে মাথায় হাত মুছলেন। 'সাধু সাবধান' ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হল। সনাতন গদাধর দিব্যভাবে নৃত্য করতে লাগলেন। 'জয় মহাপ্রসাদ' ব'লে প্রসাদের মহিমা প্রচার করলেন।

প্রদ্যুম্ন পণ্ডিত হাত জোড় ক'রে বললেন, স্নান না ক'রে অমার্জন অবস্থায় কি প্রসাদ গ্রহণ করা যেতে পারে? গোরা বললেন, এই মহাপ্রসাদই তো সমস্ত শৌচের অর্থাৎ পবিত্রতার মূল। মহাপ্রভু আরও বললেন, যদি কোন সময় একাদশীর দিন তোমার কাছে প্রসাদ এসে যায় তাকে সৌভাগ্য মনে ক'রে হস্তে ধারণ পূর্বক অভুক্ত শরীরে নিরন্তর নাম করবে। আর যখন একাদশী গিয়ে দ্বাদশ তিথি আসবে তখন সঙ্গে সঙ্গে দ্বাদশী পারণ রূপে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবে। যদি তা না কর তাহ'লে কণিকামাত্র গ্রহণ করবে। সে কৈবল্যপ্রসাদ গ্রহণ করলে কখনও অপরাধ হয় না। হরিবাসরে নিশ্চয় ভোজনবর্জিত থাকবে। রাত্রে থাকবে নিদ্রাবর্জিত। নাম চলবে অবিরত। যদি শিবের বার সোমবার একাদশী হয়, তাহ'লে শ্রীক্ষেত্রে প্রসাদ গ্রহণ করাই একান্ত নিয়ম। বৈষ্ণব অগ্রণী শিবের আচরণ দেখ। প্রসাদ প্রাপ্তিতে কৃষ্ণপ্রাপ্তি মনে করে তাঁর মহা সুখ। তুলসী, গঙ্গোদক, হরি পদোদক আর প্রসাদ এই চারটি বস্তুই সম ভাবে সব বিচারের উর্দ্ধে। গুরু পাদোদক সর্বদা পবিত্রকর। এর মত বিষ্ণুব্রত আর নেই। নামব্রহ্মের কোন কালবিচার থাকে না। তেমনি অন্ন ব্রহ্মেরও কোন প্রকার কালবিচার থাকা উচিৎ নয়।

পট্টমহিষীর শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু ভাগবতী জগন্নাথ দাস। জগন্নাথের চরণ সেবক। জগন্নাথ বৈষ্ণব, গোস্বামী ব্রাহ্মণ। চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে আকুল চিত্তে প্রতিদিন মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করেন। তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে ঘরে ফিরে যান। রাধাষ্টমীর দিন ছিল তার জন্মবাসর। বেড়া সংকীর্তন শেষ করে, মনে মনে চৈতন্য প্রভুকে প্রণাম করার সংকল্প নিয়ে মন্দিরে গিয়ে দেখলেন, গৌরাঙ্গসুন্দর গরুড় স্তম্ভের পিছনে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে জগন্নাথ দাস। প্রভু ভাবাবেশে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করছেন। মনে হল প্রভুর হৃদয় আবেগে উদ্বেল। কিন্তু ধ্যান অর্চনার সময় হঠাৎ যেন অন্তরে দুখী হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণমন্ত্রের ধ্যানে মগ্ন প্রভু মনে মনে সিদ্ধ বকুল ফুলে মালা গেঁথে গ্রন্থি দিয়ে আপন ইষ্টকে সমর্পণ করলেন। দেখলেন গ্রন্থি থাকার জন্য, জগন্নাথের মাথায় পরানো যাচ্ছে না। মন সন্তপ্ত, হৃদয় আবেগে ভেঙ্গে পড়ছে। বেপথু শরীর। চোখে অশ্রু ঝরছে। এই ভাবটি, ভাগবতী, দূর থেকে বুঝে নিয়ে বিনীত ভাবে বললেন, হে মহান, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন। নিয়ম আছে, জগন্নাথের মালায় গ্রন্থি পড়েনা। কোন বাঁধনই প্রভুকে আবদ্ধ করে না। তাই গ্রন্থি থাকার জন্যই হে প্রভু ভুবনসুন্দর, আপনার মালা-খানি ভগবানের গলাতে পরানো যাচ্ছেনা। প্রভু আমার অপরাধ ক্ষমা কর। মালাটি গ্রন্থি মুক্ত করে দুটি হাতের ওপর পরিয়ে দাও। আতুরের ব্যথার মধ্যে দিয়েই এই গ্রন্থি বিরহিত মালার চরিত প্রকটিত হল। প্রভু আপনার উত্তরীয়টি খুলে জগন্নাথ দাসের মাথায় বেঁধে দিলেন। বললেন, আজ থেকে তুমি 'অতি বড়'। তোমার বৈষ্ণব শাখা 'অতি বড়' বৈষ্ণবশাখা বলে খ্যাত হবে। তুমি উদার ভাগবতপ্রাণ, অনেকদিনের আশা আজ পূর্ণ হ'ল। শ্রীচৈতন্য ও জগন্নাথ পরস্পর আলিঙ্গন করলেন। দুজনে জগন্নাথের দিকে চেয়ে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে লাগলেন। প্রভু নিজের গলার চাদর জগন্নাথকে পরিয়ে দিলেন। বড় উৎকল মোহন্তদের স্বীকৃতি আরম্ভ হল।

মত্ত বলরাম শাস্ত্রজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপাতে জগন্নাথ দাস গোস্বামী রূপে পরিচিত হলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকেই

এঁদের গুরু পরম্পরা আরম্ভ হ'ল। অতিবড় বৈষ্ণবশাখা প্রবর্তনের সংবাদে সকলেই আনন্দিত হলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি করণ রাজার কাছে ব্যক্ত করল। সব বৈষ্ণবরা 'জয় জয়' ধ্বনি করলেন। দুই মহাপুরুষের এই মধুর মিলনের আনন্দে নানাবিধ উৎসব আচরিত হ'ল। রাজা প্রতাপরুদ্র দেব এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির স্মৃতিরক্ষার্থে ভগবানের পবিত্র বস্ত্র পাঠিয়ে দিলেন। পরমানন্দ মহাপাত্র ঐ বস্ত্র নিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্মুখে প্রণিপাত করলেন। সাতাশ শ, বৈষ্ণব উৎসবে অংশ গ্রহণ করলেন। জগন্নাথকে সিংহাসন মার্জনার সেবা মহারাণীর পক্ষ থেকে দেওয়া হল। আর সিংহাসনের উপরি ভাগের নির্মাণ সেবা, রাজা নিজ গুরুজ্ঞানে সমর্পণ করলেন। রাধাকান্ত ও গোপীকান্ত দুই পীঠের অপূর্ব মিলন হল। নামধর্মের প্রচারও চলতে লাগলো। উভয়ে উভয়ের মহানায়ক পদবী প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু গোরারায় সেই রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করলেন না। এই কথা উড্র দেশে প্রচার হয়ে গেল আর এইভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কীর্ত্তি বিস্তার লাভ করল।

নামের দুটি ভেদ দেখা দিচ্ছিল। একটি 'হরে কৃষ্ণ রাম' অপরটি হ'ল 'হরে রাম কৃষ্ণ'। উভয়ের সমন্বয় ঘটল। গৌড়ীয় এবং উড়িয়া ভাবের ভেদাভেদ মনে আর রইল না। এ সমস্তই প্রভু চৈতন্যের কৃপার ফল। উভয় মঠকে রাজকীয় সম্মান দেওয়া হল। কিন্তু বৈষ্ণব নম্রতাগুণে কেউ সে সম্মান গ্রহণ করলেন না। কুমার পূর্ণিমার সময়, শ্রীচৈতন্য আর জগন্নাথ দাসকে নিয়ে বৈষ্ণবদের চারটি সম্প্রদায় আঠারোটি খোল বাজিয়ে নগর সংকীর্তন করলেন। সিংহদ্বারে হরি লুঠ হ'ল।

রাজকর্মচারীরা দুই মত প্রকাশ করলেন। কেউ বলল জগন্নাথ দাস শ্রেষ্ঠ। কেউ বললে চৈতন্য। সেই সময় কার্ত্তিক মাস, কৃষ্ণ চতুর্থী তিথিতে প্রবল ঝড় উঠল। কেউ বাড়ী থেকে বেরোতে পারলেন না। পাকশালা থেকে প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে এসে মঙ্গল আরতি হওয়ার কথা। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ে আগুন আনা যাচ্ছেনা। আরতির বিলম্ব হচ্ছে। ভক্তরা দুটি প্রদীপ সাজিয়ে রেখে হতাশভাবে বসে রইলেন। এই সময় মঙ্গল আরতি

দর্শনের জন্য দুই মহাপুরুষ এলেন। কূটনৈতিক কর্মচারীরা বিচার করলেন, এই একটি সুযোগ এসেছে। যাতে আমরা পরীক্ষা করব, শ্রীচৈতন্য ও জগন্নাথ দাসের মধ্যে কোন মহাত্মা শ্রেষ্ঠ। আখণ্ডল পাত্র নামে এক কর্মচারী বললেন, ঠাকুর দেখ, ঝড়ো বাতাসে প্রদীপ জ্বালান যাচ্ছেনা। এখন বল কি করব ? প্রভু গৌরহরি গৌরচন্দ্র একটি প্রদীপ হাতে তুলে নিয়ে সংকীর্তনের মধ্যে নৃত্য করতে লাগলেন। প্রবল ঝড়ের মধ্যে প্রদীপ জ্বলে উঠল। প্রভুর নৃত্যের সঙ্গে দীপ শিখাও নৃত্য করতে লাগল। নিভে গেলনা। জগন্নাথ আর একটি প্রদীপ তুলে নিলেন। প্রভুর নামের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন। তাঁরও দীপ জ্বলে উঠল। দুই মহাজন দুটি অখণ্ড দীপ ধরে সহাস্য বদনে জগমোহনে প্রবেশ করলেন। জয় বিজয় দ্বারে প্রদীপ রাখলেন। দ্বার খোলা হল। আরতি হ'ল। দুজনেই অপ্রাকৃত ঘটনা প্রকাশে সফল হলেন, সিদ্ধ হলেন। অগণিত মানুষ এলো দর্শন করতে। মন্দিরে কর্মচারী পরিচ্ছা বললেন, এতো সাধারণ কথা নয়। সাধুর হাতে দুটি দীপ জ্বলে উঠল। সিদ্ধির প্রমাণ রইল। রাজাজ্ঞায় এই সিদ্ধি চিরকাল রইল। দুজনের কীর্ত্তি অখণ্ড জ্যোতির মতই রইল। প্রতিবছর কার্ত্তিক মাসে জয় বিজয় দ্বারে গম্ভীরা থেকে পাঁচটি ও জগন্নাথ দাসের ওড়িয়া মঠ থেকে পাঁচটি এমনি দশটি প্রদীপ নিশ্চিতভাবে প্রজ্বলিত হয় দুই মহাপুরুষের নামে। একটি কৃষ্ণভাবে অপরটি রাধাভাবে। এই আদেশকে সবাই ধন্য ধন্য করল। সার্বভৌম কার্ত্তিক মাসে 'বালধূপ' সংকীর্তন করলেন। খন্তা ধ্বজা উভয়কে প্রদান করা হল। এই কীর্ত্তি, সিদ্ধি সবই চৈতন্যচন্দ্রের মহিমার প্রতীক।

মার্গশীর্ষ পঞ্চমীর দিন। নিযোগের মুখ্য লাবণ্য দেবদাসী অন্তিমকালে নৃসিংহবল্লভ উদ্যানে নৃসিংহ চরণ ধ্যান করে প্রায়োপবেশন ক'রে মধুর কণ্ঠে 'গীত গোবিন্দ' গান করছিলেন। প্রভু সংকীর্তন নিয়ে সেই পথে টোটা গোপীনাথ যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শুনলেন গীত-গোবিন্দের মধুর স্বর,—'সা বিরহে তব দীনা'। প্রভু চকিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ! কে এমন মধুর স্বরে গাইছে হরিরসসার। সমগ্র গীত শেষ হ'ল। প্রভু নৃসিংহ

টোটাতে প্রবেশ করলেন। প্রভুকে দেখে লাবণ্য শরীর ত্যাগ করল। প্রভু বললেন, এই বৈষ্ণবী সাধারণ নারী নয়। এই সাধ্বী সতীকে স্বর্গদ্বারে দাহ কর। কৌড়িবাণ জমিদার, কানাই খুন্টিয়া সমস্ত ব্যয় বহন করলেন। প্রভুনন্দসুত, দাসীকে উদ্ধার করলেন। মালার ফুল প্রভুর কাছে রইল। পাটের সূতা মুক্তি পেল। রামানন্দ রায় বললেন—দাসী পার হ'য়ে গেল।

টোটা গোপীনাথ দর্শন করে প্রভু গম্ভীরায় ফিরে এসে সকল বৈষ্ণবকে আহ্বান করলেন। ইঙ্গিত মাত্রে সকলে এসে সমবেত হ'ল। মহাপ্রভু বললেন, আমি জগন্নাথ শরীরে অপ্রকট হব। আঠারো বছর তার সঙ্গ সুখ লাভ করলাম। তোমাদের যা প্রশ্ন আছে জিজ্ঞাসা কর। আমি তোমাদের আশা পূর্ণ করব। এই সিদ্ধান্ত জানবে। সবাই আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। বলল—'হে ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছার কি কেউ অন্যথা করতে পারে? কিন্তু মীন যেমন জল বিহনে, পদ্ম যেমন সূর্য বিহনে তোমা বিহনে, আমাদেরও অবস্থা তেমনি। সব ছেড়ে তোমার পাদ-পদ্ম সম্বল করেছি। তুমি ছাড়া আমাদের অন্য কোন গতি নেই। তোমার চরণে আমাদের মতি থাকুক।

প্রাণের ঠাকুর বললেন, 'বৈষ্ণবদের গতি কেবল বৈষ্ণব' এই কথা জেনে রাখ। আমাদের গতি কেবল সেই কৃষ্ণ প্রাণপতি, প্রভু জগন্নাথ। সেই বৈষ্ণবের প্রাণপতি সেবা আমাদের অনন্য সার পথ। তাঁর শ্রীঅঙ্গে আমি যুগ যুগ ধরে মিলিত হয়ে থাকবো, বিষ্ণুর সুখের জন্য। যেখানে নাম এবং কীর্তন সেইখানেই আমার নিবাস। এই কথা দৃঢ়ভাবে স্মরণ রেখো। এই ঘটনা দেখে শিখি মহান্তি রাজবাটীতে প্রবেশ ক'রে রাজাকে সংবাদ দিলেন। তৎক্ষণাৎ ভগবৎ আরাধনা ক'রে এসে বেদীর কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। প্রভু গদগদ স্বরে নামের মাহাত্ম্য ও প্রেমের লক্ষণ সবিস্তারে বলতে লাগলেন। বললেন, সাধন উত্তম ভক্তি। ভক্তিই শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু কেমন ভক্তি, নির্ণয় করে নিও। 'হেতুকী, অহেতুকী না অনন্য?' নাথের কাছে কিছু প্রাপ্তি ইচ্ছা থাকলে তাকে হেতুকী বিকার বলে। কিন্তু কামনার অন্ত নেই। বহু দোষসার। অভীষ্ট

প্রাপ্তির পর পুনঃ কামনা জাগ্রত হয়। অহেতুকী ভক্তির লক্ষণ হ'ল নিষ্কাম শ্রদ্ধা বিশ্বাসের সঙ্গে নিত্যকর্ম। সেই নিত্য কর্মই দিব্যকর্ম। তার দ্বারা অবশ্যই প্রাণের ঠাকুর 'কৃষ্ণ' প্রাপ্ত হন। নিত্যকর্মেও অবসাদ আসতে পারে। অহেতুকী অবসাদ এলে পরে সে ভক্তি হেতুকীতে পরিণত হয়। তাই, অনন্যই শ্রেষ্ঠ। অনন্য ভক্তির লক্ষণ হল প্রেমভক্তি। না তাতে লেশমাত্র প্রাপ্তির ইচ্ছা আছে, না অপ্রাপ্তির ইচ্ছা আছে। আকাশে চাঁদ আছে পৃথিবীতে সমুদ্র আছে। কখনও আকাশ আর সমুদ্রের মিলন হয়না। তথাপি উভয়েই মিলনের জন্যে ব্যাকুল। তেমনি প্রেমী প্রেমাস্পদ ভাব।

প্রভু নিজের গলার মালা প্রতাপরুদ্রকে পরিয়ে দিলেন। প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত আকুল হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। রামানন্দ তাকে সান্ত্বনা দিলেন। রাজা বললেন, হে ঠাকুর অকিঞ্চনকে, আদেশ করুন, আমি কি করবো। মহাপ্রভু বললেন, নাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই। জগন্নাথ সেবা বিনা তোমার অন্য কর্তব্য নাই। শ্রীক্ষেত্রে, গোস্বামীদের যোগ্য মর্য্যাদা প্রদান কর। তাতে নামধর্মের প্রচার হবে।

রাজা নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করে সুন্দরা সাহিতে ভূমি দান করলেন। বললেন, আপনি রাণী ও যুবরাজকে দীক্ষা প্রদান করবেন। কুলগুরুরূপে এই ভূমি ভোগ করবেন। অদ্বৈত প্রভুকে রাজা সসম্মানে বললেন, আপনি দেউল মণ্ডপ সাহি, দানভূমিতে বাস করবেন। আর মহাপ্রভুর ভোগের পরিচর্য্যা করবেন। আপনার নাম ভোগ পরিচ্ছা হল। সনাতন আর গদাধরকে টোটা গোপীনাথ উদ্যান ও সমুদ্র কূলের ভূমি দান করলেন। ব্রহ্মচারী উপাধিধারী সুবর্ণদেবকে দুই বাটি জমি দান করলেন। পূর্ণিমার দিন 'জলধিবাস দেবস্নান সেবা দান করলেন। রত্নসিংহাসন সেবার ভার দিলেন। গোপাল ভট্টকে গোপাল বল্লভ নামক অত্যন্ত রমণীয় বাগিচা দান করলেন। সেইস্থানে পরিচ্ছা পদে সম্মানিত করলেন। আহুলা গোস্বামীকে 'চষাপোড়া' ভূমি দান করে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অতিবড় জগন্নাথকে মহারাণী কনক মুণ্ডাই দান করলেন আর দিলেন আসন সেবার অধিকার। তিনি তা স্বীকার করলেন।

আকুল হ'য়ে রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে প্রণিপাত ক'রে বললেন, প্রভু আপনি যদি অদর্শন হন তবে আমি কেন এইক্ষেত্রে পড়ে থাকবো ?

রথ সংকীর্তন শেষ হ'ল। হেরা পঞ্চমীর সংকীর্তনও শেষ হ'ল। এই সংকীর্তনে দেখা গেল প্রভু সর্বদাই কাঁদছেন। মৌন, স্থির। চৌদ্দশ, ছাপ্পান্ন শকে (১৫৩৩ খৃঃ) এক অদ্ভুত লীলা সংঘটিত হ'ল। আষাঢ় শুক্ল সপ্তমী তিথি। আতুর ভাবে গোরা কীর্তন করতে লাগলেন। সেই গুণ্ডিচা মন্দির। অস্ত ব্যস্ত শরীর। উদ্দণ্ড কীর্তনে মত্ত। বিহ্বল গোবিন্দ ও স্বরূপকে ধরে পাদুকা কুণ্ডের সমীপে বসে পড়লেন। অপূর্ব বিরহ কীর্তন। মহারাসস্থলী প্রকম্পিত হল। বহির্বাস খুলে গেল। গলার মালা ছিঁড়ে পড়ে গেল। মহারাসস্থলী রাসগীতে অবিরাম মুখরিত। বিরহে মিলন। সবার হৃদয়ের আকুল ক্রন্দন। রায় রামানন্দের পাশে বসে সবাই কাঁদছেন। সব কিছু বেতাল। স্বর বেতাল। মৃদঙ্গ বেতাল। সবাই অনুভব করলেন, 'লীলা সম্বরণের' কাল উপস্থিত। সন্ধ্যারতির সময় হ'ল। সেবকরা আদর করে ডেকে নিয়ে গেল গৌরাঙ্গ ঠাকুরকে। প্রভু গরুড় স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে আকুল চিত্তে দর্শন করতে লাগলেন। আরতির ধ্বনি উঠল। চারিদিকে নামের ঐকতান। এই সময় জগন্নাথের গলার মালা হঠাৎ ছিঁড়ে পড়ে গেল। সহসা মহাভাব যেন শত চন্দ্রোদয়ের জ্যোতির মত দিব্য জ্যোতিতে প্রকাশিত হল। সকলের চোখের সামনে গরুড় স্তম্ভের পিছন থেকে একটি জ্যোতিঃ গিয়ে জগন্নাথের শরীরে বিলীন হয়ে গেল।

জয় হরি। জয় গৌর হরি। জয় নীলাচলপতি ধ্বনিতে সমস্ত গুণ্ডিচা মণ্ডপ মুখরিত হয়ে গেল। প্রভুর স্বরূপ আর দেখা গেল না। সবাই বললে কোথায় গেলেন ? কেউ বললেন, সিংহাসনের দিকে গেলেন। প্রতিহারীরা বললো না, প্রভু সিংহাসনের দিকে তো যান নি। বৈষ্ণবরা আকুল হ'য়ে গুণ্ডিচা মণ্ডপের বনস্থলী খুঁজতে লাগলেন। কয়েকজন ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের দিকে গেলেন। সেখানে গিয়েও নিরাশ হলেন। কিছু

লোক নৃসিংহ বল্লভ আইটোটায় সন্ধান করলেন। সেবক গোবিন্দর সঙ্গে কিছু বৈষ্ণব শোকাকুল হ'য়ে সমুদ্রের ধারে খুঁজে দেখলেন। শ্রীমন্দির, সিদ্ধবকুল সব জায়গায় দেখা হ'ল। কোথাও কোন সন্ধান মিলল না। কর্মচারী অনন্ত সিংহ অশ্বারোহণে খুঁজতে বেরোলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। কোথায় গেলেন প্রভু? রামানন্দ রায় বললেন হয়তো তিনি গোপীনাথ মন্দিরে থাকবেন। দেখলেন সেখানে বহির্বাস পড়ে আছে। সবাই আবার মন্দিরে গেলেন। কিন্তু মহাপ্রভুকে না দেখে পুনঃ কাতর হয়ে পড়লেন। বৈষ্ণবরা আতুর হয়ে বললেন, বোধহয় প্রভু অচেতন হ'য়ে পড়েছিলেন। কোন ভক্তজন মহাপ্রভুকে এখানে নিয়ে এসেছেন। তা না হ'লে বহির্বাস এখানে পড়ল কেমন ক'রে? রায় রামানন্দ বললেন, শোকে অধীর হওয়া বৈষ্ণবের লক্ষণ নয়। এ সাধারণ লোকের লক্ষণ। দেখ এখানে বহির্বাস প'ড়ে আছে। আরও দেখ টোটা গোপীনাথের জানুদেশে একটি ক্ষত চিহ্ন হয়েছে যা আগে ছিল না। আমার মনে হয়, দিব্য সত্তা এই পথ দিয়ে বিগ্রহে বিলীন হয়ে গিয়েছেন। সবাই হরি নাম করলেন। স্বেচ্ছা নির্মিত তনু, জগন্নাথের দেহে বিলীন হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে হরিধ্বনি ক'রে সেই ব্যবহৃত বস্তু যে গুলি পড়েছিল, সেগুলি নিয়ে সমাধি রচনা করলেন। অখণ্ড কীর্তন চলল। স্বরূপাদি উল্টোরথের কীর্তন করলেন। অখণ্ড নামযজ্ঞ চলল। কীর্তনে শ্রীচৈতন্যের অমৃতময় বাণী গান করলেন। নিষ্ঠাভরে বেড়া সংকীর্তনও চলল। কাতর হৃদয়ে নাম উচ্চারণে সবাই প্রেমে বিভোর হলেন। শুক্লা দ্বিতীয়াতে জগন্নাথ মন্দিরে সবাই প্রবেশ করলেন। অখণ্ড নাম শেষ হল। গৌড় ভক্তরা স্বদেশে গমন করলেন। রাধাকান্ত মঠে বা গম্ভীরাতে মহাপ্রভুর পাদুকার অভিষেক হ'ল। সেই পাদুকা দুটি 'গম্ভীরা-ঈশ্বর' ব'লে ঘোষিত হ'ল। রাধাকান্ত দেবের সেবা পূজা নিয়ে সবাই শান্ত হয়ে গেল। সকলের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হ'ল। রাজা নতুন কাঠের শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি তৈরী ক'রে বালি নবরর নগরে প্রতিষ্ঠা করলেন। সংকীর্তন মহোৎসব হল। আটষট্টি সম্প্রদায়ের সাকারবাদী বৈষ্ণব একত্রিত হলেন। জগন্নাথ দাস

পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করলেন। বিপুল মহাপ্রসাদের সেবা হল। নাম সংকীর্তনের সেবা শ্রীধামে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সবাই বিদায় নিলেন। রামানন্দ রায়কে সঙ্গে নিয়ে রাজা কটকে ফিরলেন। পুরুষোত্তমে গৌর লীলা এইভাবে সমাপ্ত হল। কিন্তু নিত্য বেড়া সংকীর্তন হতে লাগল।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরেকৃষ্ণ হরেরাম শ্রীরাধা গোবিন্দ॥

গম্ভীরায় এই নাম সার হল। (আজও এই নাম চলছে অহরাত্র)। আমার চুয়ান্নটি লীলা বর্ণনা এখানে সমাপ্ত হল।

আমি এই বর্ণনাকে চুয়ান্ন দানার মালার মত শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে সমর্পণ করলাম। অধমের উপর তাঁর অপার কৃপা। তাই ভক্তসঙ্গ পেয়েছি। কৃতার্থ হয়েছি। গুরু বৈষ্ণব সেবায় আমার জীবন ধন্য হয়েছে। তাই আমি এই চকড়া লেখা সম্পুর্ণ করতে সক্ষম হয়েছি।

আমার বাড়ী বালিসাহি ঘনামল্ল পাটনায়। আমার পিতা পীতাম্বর। ভাই কৃত্তিবাস। আমাদের কৌল ব্যবসা হ'ল মন্দিরের পঞ্জিকা লেখা। রাধাকৃষ্ণ ভাবের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল। তারই ভাবময় প্রতীক গোরা রসিকশেখর, শ্রীক্ষেত্রে যে যে লীলা করলেন সেগুলি লেখবার আশা জেগেছিল। বৈষ্ণব ভিন্ন এ হেন কথা লিপিবদ্ধ করার সামর্থ্য কার থাকতে পারে? আমি শ্যামানন্দ কুঞ্জমঠে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলাম। আমার পট্টনায়ক সামন্ত পদ ছিল। তা ত্যাগ করে দাস পদবী নিলাম। নাম হ'ল আমার গোবিন্দ দাস বাবাজী। দৈবাৎ আমার পত্নী 'হীরা' হারিয়ে গিয়েছিল। গুরু গোবিন্দের কৃপায় আজ আমি অমূল্য সম্পদ পেয়ে ধন্য হলাম।

চৌদ্দশ আটান্ন শকাব্দে (১৫৩৩ খৃঃ) আমি এই গ্রন্থখানি শেষ করলাম। এই চকড়া পাঞ্জীটি লিখে আমি রাজার সামনে নিবেদন করলাম। এতে কেবল পুরী শ্রীক্ষেত্রে আচরিত চরিত ভিন্ন অন্য কোন লীলা নেই। যা আমি চোখে দেখেছি, যা আমি সাধু মুখে শুনেছি তাই

লিখে রাখলাম, প্রত্যক্ষ রাজাজ্ঞায়। প্রভু নীলাদ্রি চরণ স্মরণ ক'রে চৈত্র শুক্ল নবমীতে আমার লেখা সমাপ্ত করলাম। হে চৈতন্য গোঁসাই, আমার যদি কোন ত্রুটি থাকে আপনি নিজগুণে তা ক্ষমা করুন এই নিবেদন।

ইতি শ্রীচৈতন্য চকড়া সম্পূর্ণ
জয় গৌরাঙ্গ ইতি—

লিপিকার—শ্রীশ্রীরসিকরাজ মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়ে
শ্রীশ্রীগঙ্গামাতা মঠ অধিকারী বাবাজী শ্রীল ভগবান দাস গোস্বামী মোহান্ত

সার্বভৌমাশ্রম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রবাসী শ্রীমন্ রসিকরাজ শরণম্ ওঁ।

শকে ষোলশ' চুয়াল্লিশ (১৭১৯ খৃঃ) ভাদ্রপদ অষ্টমী তিথি, পুস্তক লেখা সমাপ্ত হ'ল।

পাঠান্তর ১৭৪৪ (১৮১৯ খৃঃ)

———

দ্রুত মুদ্রণ হেতু কিছু ভুল ক্রুটি রয়ে গেল। তবে মনে হয় তা বিষয় বস্তুর গভীরতায় ও রসস্রোতে ভেসে যাবে।

শুদ্ধিপত্র

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	পংক্তি	পত্রাঙ্ক
স্মরণ	স্মরণ	৪	২
দেখি তার	দেখিতার	৫	২
উৎকলি	উংকলি	৪	৩
পুরে পুরে	পুবে পুবে	১	৬
আছেন	আছে	৯	৬
নদীয়াবিনোদ	নদীয়া বিনোদ	১০	৬
মুখ্যত	মূখ্যত	১৩	৬
মুখ্যমন্দির	মূখ্যমন্দির	১৩	৬
জন্ম থেকে	জন্মে থেক	১৫	৬
পঞ্চক রে	পঞ্চ করে	৪	৭
ভাগবতে যে	যে ভাগবতে	৯	৭
আস্বাদন	আস্বাদান	৯	৭
উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যে	৯	৭
শয়ন	শায়ন	১৪	৭
মুখ্য	মূখ্য	১৪	৭
রাজার	বাজার	৪	৮
আদিবশ্যা	আদিকন্যা	৯	১০
প্রথমে	প্রজমে	১০	১০
আস্তেব্যস্তে	আস্তেবাস্ত	১০	১০
তোড়ি	তাড়ি	৭	১১

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	পংক্তি	পত্রাঙ্ক
সমাযুক্তং	মমাযুক্তং	১০	১১
তদ্বিদ্ধিহরিমন্দিরম্	তদ্বিত্থহরিমন্দিরম্	১০	১১
বিভাব	বিভব	২	১৪
ভাবর	ভাবব	২	১৪
সেঠাবে	মেঠাবে	৫	১৭
অটন্তি	অটান্ত	১০	১৭
দারুবিগ্রহ	দারবিগ্রহ	১৩	১৭
এথি	এঠি	৩	১৮
গোসাইঙ্ক	গোস্বামীঙ্ক	৩	১৮
গোসাঁইর	গোসাইঁব	১	২০
কণ্ঠী	কঠী	৩	২০
যেনা	জেলা	১	২১
ধীর	বীর	৫	২১
কহ	তহ	৬	২১
শ্রীজগন্নাথের	শ্রীজন্নাথের	১০	২১
ডাক হরকরা	ডাক হড়করা	৫	২৩
প্রতিষ্ঠিত	প্রতিষ্ঠিতা	৭	২৪
মূরতি	মুরতি	২	২৭
জৈষ্ঠ্য	জ্যেষ্ঠ	৩	২৭
বিভুষিতম্	বিভূষ্যিতম্	৭	২৭
ত্রয়	এয়	৮	২৭
নেত্রাশ্রু	নেত্রাশ্র	৫	৩০
চূড়াদহি	চুড়াদহি	৭	৩০
পহুণ্ডি	পহণ্ডি	২, ৪	৩১
মার্জ্জনী	মাজ্জনী	৭	৩১
আণ্ঠে	আষ্ঠে	৫	৩২
শিখি	শিখর	৬	৩৪
ত্রয়	এয়	৯	৩৬

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	পংক্তি	পত্রাঙ্ক
গণঙ্কর	গণকর	১	৩৭
মুরলী	মুরালী	৫	৩৭
রামাহুতি	রামাহুতি	১	৩৮
মম	সম	১০	৩৯
ন মনস্তি	নুনস্তি	৯	৪২
তিলকণারু	তিল কণারু	৭	৪৪
বুঝাই	বুলাই	৬	৪৫
গোপীনাথে	গাপীনাথে	৮	৪৬
অহনুনিয়া	অহমুনিয়া	৭	৪৭
কাষ্ঠমণ্ডপ	কাষ্ঠ মণ্ডপ	১	৪৮
প্রতাপপুর	প্রতাপ পুর	১	৪৮
ভূস্মুরক	ভুস্মুরক	১	৪৮
বাধকি	বাষ কি	৪	৪৮
তাহাঁই	তাহাই	৫	৪৮
কদা ন	কদান	৭	৫১
গৌরাঙ্গ সুন্দর।	গৌরাঙ্গ···	৯	৫২
লাগিব	লাগির	৬	৫৩
সত্তাইস'শ	সত্তাইস	৩	৫৪
চষা-পোড়া	চষা পোড়া	৮	৫৮
সম্ভালিবারে	সম্ভলিবারে	২	৫৯
শ্যামানন্দ	শ্যামনন্দ	৯	৬১
তাঁর	তার	১১	৬৫
চৌদিক	চোদিক	১	৬৭
কাঁপিয়ে	কাঁপিযে	২	৬৭
প্রভু	প্রভুর	৩	৬৯
এই	এইঁ	১০	৬৯
কর্মচারীরা	বর্মচারীরা	৪	৭০
চন্দনচর্চিত	চন্দনচচিত	১৩	৭০

শুদ্ধ	অশুদ্ধ	পংক্তি	পত্রাঙ্ক
প্রতীয়মান।	প্রতীয়মান	৪	৭৩
অগ্রজ	অনুজ	৪	৭৪
ত্রাণকর্ত্তা	প্রাণকর্ত্তা	৬	৭৫
আহ্লা	আহুল	১০	৭৫
স্থল	স্থল	১১	৭৫
ভাবাবেশে	ভাববেশে	২	৭৯
পহুণ্ডি	হুপণ্ডি	৭	৮২
গোপীনাথ	গাপীনাথ	৫	৮৫
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য	শ্রীষ্ণকৃ চৈতন্য	৮	৮৫
করস্পর্শে	কর স্পর্শে	১৩	৮৯
প্রভুর	প্রভু	৬	৯০
দাঁড়িয়ে গেলেন।	দাঁড়িয়ে।	১০	৯২